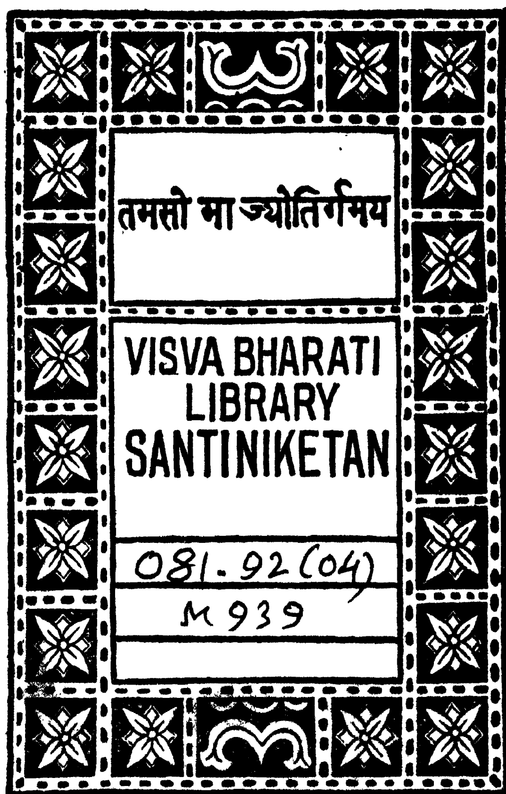
আমরা মনে
করেছিলুম যে তুমি হয়ত এদিকে
ফিরে বক্সার হয়ে যেতে পার।
আমরা আমাদের চিঠি-লিখার
মনে করেছিলুম তোমার ওখানে
যাবার জন্যে, কিন্তু শেষ কালে
শুনলুম ডাক্তারদের বোধ
যেতে সুবিধা নেই।

মৃণালিনী

মৃণালিনী দেবী



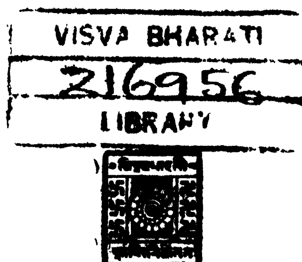
মৃ ণা লি নী দে বী



রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী

মৃণালিনী দেবী

১৮৭৪-১৯০২



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

রবীন্দ্রভবন কর্তৃক সংকলিত

২২ শ্রাবণ ১৩৮১

প্রকাশক

রণজিৎ রায়

বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

মুদ্রক

শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

১°১

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর কোনো সুসংবদ্ধ জীবনকথা নেই। অথচ কবিপত্নী সম্পর্কে সর্বসাধারণের জানবার আগ্রহ যে ঐকান্তিক, তার পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিচারণ বিভিন্ন পত্রিকায়, গ্রন্থে এবং পাণ্ডুলিপিতে ছড়িয়ে আছে। মৃণালিনী দেবীর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সেগুলি সংকলন করে প্রকাশ করা হল। সংকলনটি থেকে কবি-পত্নীর একটি সমগ্র পরিচয় পাওয়া যাবে আশা করি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী সহজলভ্য এবং সুপরিচিত গ্রন্থ সেজন্য এই বই থেকে মৃণালিনী দেবী সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হয়নি। অন্যান্য রচনার কোনো কোনোটির অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী রানী চন্দ, শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ, শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ সেন এবং শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই রচনাগুলি সংকলন করা সম্ভব হল। আমরা তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত বইপত্র, পাণ্ডুলিপি, ছবি ইত্যাদি এই সংকলনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। বিবাহের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা অন্যান্য কাজে আমাদের বিশেষরূপে সহায়তা করেছেন।

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মৃণালিনী দেবী

শর্বরী গিয়াছে চলি ! দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিসিয়া তারে
'অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার ! মন্ত্রজার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক।'

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমার motto নয়।

প্রিয় বাবু —

আগামী রবিবার ২৪শে
অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভ-
লগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক।
আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে
৬ নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি
সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং
আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।
ইতি।

অনুগত
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র

মৃণালিনী দেবী

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খুলনা জিলার দক্ষিণডিহি গ্রামের শুকদেবের বংশধর বেণীমাধব রায়চৌধুরীর প্রথম সন্তান ভবতারিণী (মৃণালিনী)। তাঁহার জন্মবর্ষ ১২৮০ সাল।··· খেলা-ঘরে ঘরকন্নার সময় মৃণালিনীর স্বভাবের একটি বিশেষত্ব সকলেই লক্ষ করিতেন, ইহা সঙ্গিনীদের উপর তাঁহার কর্তৃত্বের সখীসুলভ অধিকার, ইহাতে কর্তৃত্বের সহজাত তাপ-চাপ ছিল না, সখীসুলভ প্রণয়প্রবণতায় ইহা সুস্নিগ্ধ কোমল সহনীয়; সঙ্গিনীরা তাই সখীর নির্দেশ মানিত, খেলাও চলিত সখীভাবে অবিরোধে।···

দক্ষিণডিহি গ্রামে এমন কি গ্রামের চতুর্দিকে ক্রোশের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না। গ্রামে একটি প্রাইমারি পাঠশালা ছিল, এই পাঠশালায় মৃণালিনীর বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত অবাধে পড়াশুনা চলিয়াছিল। কিন্তু সমাজে নিন্দার ভয়ে সুদূর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই; কাজেই বাংলা লেখাপড়ার সাধ ইচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এইখানেই মিটাইতে হইয়াছিল।···

১২৯০ সালে চব্বিশে অগ্রহায়ণ রবিবারে রবীন্দ্রনাথের সহিত মৃণালিনী দেবীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ চতুর্বিংশতিবর্ষীয় যুবক, মৃণালিনী দেবীর বয়স একাদশ বর্ষ। বিবাহে ঘটকালি করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাতুল ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা আদ্যাসুন্দরী। প্রচলিত প্রথানুসারে কন্যার পিতা তাঁহার বাড়িতে বর লইয়া বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে মহর্ষি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইবে। এই প্রস্তাব স্বীকৃত হইলে মহর্ষি দক্ষিণ-ডিহির বাড়িতে নানাবিধ খেলনা বসনভূষণাদি কর্মচারী সদানন্দ মজুমদারের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সদানন্দ মহর্ষির কথানুসারে গ্রামে নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া কন্যার ও প্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা বোধ হয় 'কন্যার আশীর্বাদ' বা 'পাকা দেখা'র সামাজিক বিধি।

বিবাহে মহর্ষির যে বংশ-গোত্রের বিবেচনা ছিল, এ বিবাহে তাহার ব্যভিচার হয় নাই। সমৃদ্ধি ও বিদ্যাবত্তায় রায়চৌধুরীবংশ ঠাকুরপরিবারের সমতুল না হইলেও এই বৈবাহিক সম্বন্ধে মহর্ষিদেবের মতদ্বৈধ ছিল না। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ব্রহ্মোৎসব-দালানে কুলপ্রথানুসারে পরিণয়োৎসব শুভসম্পন্ন হয়। নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত মহর্ষি সমাজেতে কনিষ্ঠ পুত্রের শেষ সামাজিক কার্য নিষ্পন্ন করেন।

পিতৃগৃহে কন্যার নাম ছিল 'ভবতারিণী', রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সংগতি রক্ষা না হওয়ায় বিবাহের পরে পরিবর্তিত নাম হইল 'মৃণালিনী'। রবি-মৃণালিনীর প্রণয়-সম্বন্ধ কবিকল্পিত, চিরপ্রসিদ্ধ; তাই মনে হয়, এই নাম কবিকৃত কবিকল্পনাজাত। মতান্তরে, কবির প্রিয় 'নলিনী' নামের ইহা প্রতি-শব্দ। যাহাই হউক, 'ভবতারিণী' বধূজীবনে 'মৃণালিনী' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি যে 'ধরার সঙ্গিনী'র চিত্র বর্ণনার নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার কল্পনামাত্র নহে, ইহা বাস্তবিকের অনুভূতি-অনুস্যূত পরিণাম; কবির সেই চিত্রগত বর্ণ কবিপত্নীর সাংসারিক জীবনে নানাবিষয়িনী শক্তিতে মূর্ত ও সার্থক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে।

পিতৃগৃহে মৃণালিনী দেবীর বিদ্যাশিক্ষার যে ক্ষুদ্রতম পরিধি তাহা ঠাকুর-পরিবারের বধূগণের ও কন্যাদিগের বিদ্যার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। প্রতিভাবান সুশিক্ষিত কবির অনুরূপ স্ত্রীরত্ন লাভ বিরল হইলেও একান্ত বিরল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সৌভাগ্যমূলক ভবিতব্যতা সর্বত্র অবাধ; তাই মহর্ষির এই পরিণয়ে অসম্মতির কোনো কারণ ছিল না; কবিও পিতৃদেবের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু সহধর্মিণীকে অন্বর্থ সহধর্মিণী করিবার নিমিত্ত কবি নববধূর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, এমন কি বালিকা বধূকে লরেটো হাউসে পড়িবার অনুমতি দিলেন।

এই সময়ে নগেন্দ্রনাথ দিদির কাছে আসিয়া একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়িতেন। অবসরক্রমে দিদি পড়া বলিয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেন। কখনো কখনো নগেন্দ্রনাথ দুই-একটি ইংরেজি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন, দিদি অর্থ বলিয়া দিয়া পাঠ বুঝাইয়া দিতেন।

পত্নীর ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই কবি নিরস্ত হইতে পারেন নাই।

[illegible]

মৃণালিনী দেবীর হস্তলিপি

রামায়ণাদির সংস্কৃত সহজ শ্লোকের অর্থগ্রহণ যাহাতে অনায়াসে হয় তিনি সেই উদ্দেশ্যেই পত্নীকে মোটামুটিভাবে কিছু সংস্কৃত শিখাইবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। কবির নির্দেশানুসারে বিদ্যারত্ন রামায়ণের গল্পাংশের শ্লোকের বাংলায় ব্যাখ্যা করিতেন, ছাত্রী সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহার বাংলায় অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপে রামায়ণের গল্পাংশের অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছিল।

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির শ্লোক গদ্যাংশ কখনো কখনো ব্যাখ্যা ও সরল বাংলায় অনুবাদকরিয়া কাকিমাকে বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রকারে অনুবাদের সাহায্যে ও বলেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায়, শ্লোকের আবৃত্তি শ্রবণে মৃণালিনী দেবীর সংস্কৃত-অর্থবোধে বেশ কিছু পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভবনে মায়ের স্বহস্তে পেন্সিলে লিখিত একখানি খাতা দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, খাতাখানি মায়ের লিখিত রামায়ণের সেই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। খাতা খুলিয়া দেখিলাম ইহা রামায়ণের অনুবাদ-পাণ্ডুলিপি নহে, মহাভারত মনুসংহিতা ঈশোপনিষৎ কঠোপনিষৎ প্রভৃতির অনুবাদ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।...

কবি এখন সম্পূর্ণ গৃহস্থ না হইলেও গৃহী হইয়াছেন বলা যায়। বিবাহের পর তিনি পৈতৃক প্রাসাদে নির্ধারিত প্রকোষ্ঠে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরপরিবার সুবিপুল—মহর্ষির পুত্র পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী কন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রী আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির স্থান সুবিশাল ত্রিতল অট্টালিকায়ও যথেষ্ট হইত না।

কাব্যময় জীবন উপভোগ করায় কবির পক্ষে কোনো বাধা ছিল না। একবার তিনি ইচ্ছা করিলেন, গাজিপুরে কোনো নিভৃত নিবাসে বাস করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্ভোগে কবিজীবন সফল করিবেন। এই অভিপ্রায়ে ১২৯৪ সালের শেষভাগে তিনি গাজিপুরে যাওয়া স্থির করিলেন। এই সিদ্ধান্তের অজুহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোম্যাণ্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।... শুনেছিলুম, গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত।... তারি মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।"

এখন রবীন্দ্রনাথের পরিবার ক্ষুদ্র — পত্নী মৃণালিনী দেবী, শিশুকন্যা বেলা। এই সংসার লইয়া কবি গাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাঁহার দূর-সম্পর্কিত আত্মীয় আফিম-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী গগনচন্দ্র রায় বাস করিতেন। তাঁহার সাহায্যে কবির সুখস্বচ্ছন্দে বাসোপযোগী ব্যবস্থা সমস্তই সহজেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

সপরিবারে গাজিপুরে বাস সাংসারিক কবিজীবনের প্রথম ও প্রধান পর্ব। আপনার সংসারে স্বামীকে আপনার মত করিয়া পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্ত্রীমাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। বৃহৎ ঠাকুরপরিবারের মধ্যে বাসে কবিপত্নীর সে অভিলাষ এ পর্যন্ত অপূর্ণই ছিল। গাজিপুর-বাসে পৃথক্ সাংসারিক জীবনের সূত্রপাতে তাহা এই প্রথম কার্যে পরিণত হইল; পক্ষান্তরে যৌবনের পরিপূর্ণতায় কবিও এখন প্রথম পাইলেন পত্নীকে ধরার সঙ্গিনীরূপে— প্রণয়িনী-রূপে 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে, গড়ে তুলি মানসপ্রতিমা।'

অতিরিক্ত সাজসজ্জায় কবিপত্নীর স্বভাবতই অনুরাগ ছিল না। বড় ঘরের বধূ হইলেও সামান্য বেশেই থাকিতে তিনি ভালবাসিতেন। তাই তাঁহার গহনা ছিল সামান্যই। কৃত্রিম উপায়ে রূপসৃষ্টির পক্ষপাতী কবিও ছিলেন না; তিনি বলিতেন—"মুখে রঙ মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মানুষ সাজতে চায়!"

একদিন কবিপত্নী কানে দুইটি ফুল-ঝুলানো বীরবৌলি পরিয়াছিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ কবি উপস্থিত হইলে লজ্জিত হইয়া তিনি দুই হাতে বীরবৌলি ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন; গহনা পরায় লজ্জা তাঁহার এতই ছিল। একবার কবির জন্মদিনে কবিকে পরাইবার জন্য মৃণালিনী দেবী এক-সেট সোনার বোতাম গড়াইয়াছিলেন। বোতাম দেখিয়া কবি বলিয়াছিলেন—"ছি, ছি, পুরুষ মানুষে আবার সোনা পরে, লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি!" বোতাম ভাঙিয়া কবিপত্নী ওপাল-বসানো বোতাম গড়াইয়া দিয়াছিলেন; কবি দুই-চার বার তাহা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পূর্বে শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় কবি সময়ে সময়ে সপরিবারে বাস করিতেন। দ্বিপেন্দ্রনাথও সস্ত্রীক তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। সংসারের ভার ছিল কবিপত্নীর উপর, গৃহকর্মে তাঁহার সাহায্য করিতেন হেম-লতা দেবী, দ্বিপেন্দ্রনাথ সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতেন। এইভাবে

সাংসারিক কাজ অবাধেই চলিত, খাওয়াদাওয়া হইতও চমৎকার। নানা পদ রান্নায় ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করায় মৃণালিনী দেবীর দক্ষতা ছিল অসাধারণ; প্রত্যহ নানা স্বাদু ব্যঞ্জন, সুরস মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। কবি নীচে থাকিয়া পত্নীকে ডাকিয়া বলিতেন—"লিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘি, চাই চিনি, চাই সুজি চিঁড়ে ময়দা, মিষ্টি তৈরি হবে; যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে খুব; দ্বিপু ত কখনো না বলবে না, যত চাইবে ততই দেবে, তার মত কর্তা আর তোমার মত গিন্নী হলে হয়েছে আর কি, দুদিনেই ফতুর!" কবিপত্নী গিন্নীর ভাষায় উত্তর করিতেন— "দ্বিপু সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করেও সুখ, তোমার এতে নজর দেওয়া কেন!"

রান্না মৃণালিনী দেবীর যেমন প্রিয় ছিল, পদ স্বাদু করিয়া রান্নায়ও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল তেমনই প্রশংসনীয়। মিষ্টান্নের সুরস পাক তাঁহার হাতে উৎরাইত চূড়ান্ত। নানা মিষ্টান্ন তিনি কবির জন্য প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার হাতের চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই যিনি একবার খাইয়াছেন, তাহার স্বাদ তিনি কখনো ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের দইয়ের মালপো খাইয়া নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পত্নীর ন্যায় কবিরও নূতন নূতন খাদ্য আবিষ্কারের শখ ছিল নিতান্ত কম না। পত্নীর রন্ধনকুশলতা বোধ হয় তাঁহার এই শখ বেশ একটু বাড়াইয়া দিয়াছিল। রন্ধনরত পত্নীর পার্শ্বে মোড়ায় বসিয়া তিনি নূতন রকমের রান্নার ফরমাস করিতেন, মাল-মশলা দিয়া নূতন প্রণালীতে পত্নীকে রান্না শিখাইয়া শখ মিটাইতেন এবং শিখানোর জন্য গৌরব করিয়া বলিতেন— "দেখলে, তোমাদেরই কাজ, তোমাদের কেমন এই একটা শিখিয়ে দিলুম।" কবিপত্নী হার-মানার ভাষায় মৃদুস্বরে বলিতেন—"তোমাদের সঙ্গে পারবে কে! জিতেই আছ সকল বিষয়ে।"

মধ্যে মধ্যে কবি খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া সংসারে বিষম উপদ্রবের সৃষ্টি করিতেন। পরিমাণ কখনো কখনো এত কমাইতেন যে, সংসারের সকলে স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয়ে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। চিন্তাই করো আর যাহা খুশি বলো, তাহাতে কবির দৃক্‌পাতও ছিল না, আপনার খেয়ালের বশেই তিনি চলিতেন। বধূরা কবিপত্নীকে বলিতেন— "বলুন না কাকিমা, কাকামশাইকে

কিছু পুষ্টিকর খাদ্য খেতে!" একটু বিরক্তির সহিত কাকিমা উত্তর করিতেন—"তোমরা চেন না, বললে আরো জেদ বাড়বে! না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়িতে উঠতে মাথা ঘুরে পড়ুন আগে, তার পরে নিজেই শিখবেন, কারো শেখানো কথা শেখবার ধাতের মানুষ নন!" মৃণালিনী দেবীর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী 'মাথা ঘোরা' কথামাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। রথীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সত্যই তা হয়েছিল একদিন। 'চিরকুমার সভা' একবেলা খেয়ে রাতদিন লিখে, কয়েক দিনের মধ্যে শেষ করে যখন কলকাতায় এলেন, সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় উঠতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন।" একেই বলে 'কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে।'

একস্থানে কিছুকাল বাস করা কবির স্বভাব ছিল না; শান্তিনিকেতনেই ইহার প্রমাণের অভাব নাই। ঘর ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার সময়ে গৃহস্থের নিত্যকর্মের প্রয়োজনীয় কড়া খুন্তি হাতা বেড়ি ঘটি বাটি প্রভৃতি উপকরণের বোঝা বহিয়া লওয়ায় কবির বড় বিরক্তি ছিল চিরকাল। এই সকল উপকরণ বিনা গৃহস্থের সংসার একেবারেই চলে না কবিপত্নী বেশ বুঝিতেন। অন্যত্র যাইবার সময়ে তিনি কবির অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু আবশ্যকীয় প্রধান উপকরণ সঙ্গে লইতেন, কবির স্বভাবের বিষয়ে মন্তব্যের ভাষায় বলিতেন—"দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কি করে ঘর করা যায়। ফেলে তো যাব সব, এ দিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। অতিথির কারবার তো কবির কম নয়, তখন আনো মালপো, আনো মিঠাই, আনো শিঙাড়া, আনো নিমকি কচুরি; তাও আবার অল্প হলে চলবে না, পাত্র-বোঝাই প্রচুর হওয়া চাই! সরঞ্জাম না হলে, জিনিস আসবে কোথা থেকে, সে কথা বলে কে।"...

মৃণালিনী দেবী যখন শিলাইদহে কুঠিবাড়িতে বাস করিতেন, সেই সময়ে মুলা সিং নামে একজন পাঞ্জাবী তাঁহার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ দুরবস্থা নিবেদন করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিল—"মাইজী, একটি চাকরি দিয়া আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি সপরিবারে মারা পড়িব।" দরিদ্রের করুণ প্রার্থনায় মাইজীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন না, পক্ষান্তরে অপেক্ষা করাও তখন সম্ভব হইল না; কুঠিবাড়ির দরোয়ানের কার্যে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে তিনি মুলা সিংকে নিযুক্ত করিলেন। দরিদ্রের দুঃখের কিঞ্চিৎ অবসান হইল।

মুলা সিং-এর দেহ যেমন দীর্ঘ, তেমনই পরিপুষ্ট সুগঠিত। দেহের অনুপাতে দুবেলায় চার সের আটা সে খাইতে পারিত। একমাস চাকরির পরে সে দেখিল, তাহার স্বল্প বেতন ভূরিভোজনে নিঃশেষ হইয়াছে। বাড়িতে কিছুই পাঠাইতে পারিল না, বড়ই বিষণ্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে ইহা মৃণালিনী দেবীর কর্ণগোচর হইলে তিনি মুলা সিংকে ডাকিয়া বিষাদের কারণ শুনিতে চাহিলেন, সেও অকপটে সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইল; ব্যথিত হইয়া মাইজী সেইদিন অবধি প্রত্যহ সংসারের ভাণ্ডার হইতে চার সের আটা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বেতন বৃদ্ধি হইল, কিন্তু আটার ব্যবস্থা পূর্ববৎই রহিল।

এই সময় মৃণালিনী দেবী কুঠিবাড়িতে একটি শাক-সবজির বাগান করিয়া-ছিলেন। ইহা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ছিল। অবসরমত সময়ে সময়ে মেয়েদের সঙ্গে লইয়া বাগানের কাজকর্মও তিনি করিতেন। যে-সকল এস্টেটের কর্মচারী সপরিবারে বাস করিতেন তাঁহাদের বাসায় এই বাগানের শাক-সবজি তরকারি তিনি পাঠাইয়া দিতেন। অল্পবেতনভোগী আমলাদিগের জন্য সরকারী ব্যয়ে একটি মেস করিয়া সরকারী তহবিল হইতে ঠাকুর-চাকরের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই মেসেও বাগানের শাক-সবজি তরকারি সপ্তাহে দুইবার পাঠাইতেন।

মৃণালিনী দেবী যেদিন শিলাইদহ হইতে চলিয়া আসেন সেদিন ঠাকুর চাকর ও আমলাদের বিষাদের সীমা ছিল না, বিশেষতঃ মাইজীর বিদায়ে মুলা সিং-এর কী কান্না! সে যে মাইজীর করুণায় অপার দুঃখের পার পাইয়াছিল! এ যে তাহার পক্ষে বিজয়াদশমীর দিন। বিষাদমলিন সকলকে কাছে আনিয়া মাইজী স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন—"শান্ত হও, আমি আবার আসব, তোমাদের কি কখনো ভুলতে পারি!" সস্নেহ প্রবোধবাক্যে সকলে কিছু আশ্বস্ত হইল। স্নেহের ইহাই মোহিনী শক্তি!

মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী মহর্ষির পুত্রবধূগণের কাকিমা। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকিতেন না, বির্জিতলায় একটি বাড়িতে যাবজ্জীবন বাস করিয়াছিলেন। মহর্ষিদেব এই বাড়ি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিতেন, বউমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-

সালাপ আমোদ-সামোদ করিয়া চলিয়া যাইতেন, বউমাদের সনির্বন্ধ চেষ্টায়ও কখনও জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। পরম আত্মীয়গণের সহিত ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার আপাতত বিশেষ বিস্ময়জনক। কিন্তু কার্যমাত্রের কারণ থাকে, ইহারও গূঢ় কারণ ছিল। মহর্ষিদেব ভ্রাতৃবধূর মাসহারা এক হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কোনো উপায়ে বধূমাতার প্রাণনাশ করিতে পারিলে মাসহারা দিতে হইবে না, এই অমূলক সন্দেহ ত্রিপুরাসুন্দরীর মনে দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে মহর্ষির চরিত্রে এইরূপ অভাবনীয় সন্দিগ্ধ মনোবৃত্তি স্ত্রীস্বভাবসুলভ পাত্রাপাত্রের বিচারশক্তির অভাবেই সম্ভব হইয়াছিল। যাহা হউক কাকিমার তাদৃশ আচরণের মূলে এই সন্দেহ সুদৃঢ়ই ছিল। মহর্ষির সদর খাজাঞ্চি প্রতিমাসে মাসহারা দিতে যাইতেন; তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, কাকিমা হাজার টাকার একখানি নোটই পছন্দ করিতেন, তাহাও বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইতেন।

একবার কাকিমা জোড়াসাঁকোয় আসিলে মৃণালিনী দেবী না-ছোড় হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন; বলিলেন, "কাকিমা, আপনি বারবার আসেন যান, একবারও কিছুই খান না; আমি নিজেই মিষ্টান্ন তৈরি করেছি, তা আজ খেতেই হবে।" বউমার এই অভাবনীয় সনির্বন্ধ আবদারে কাকিমা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, নানা উপায়ে বউমাকে নিরস্ত করার চেষ্টাও করিলেন; কিন্তু বউমার আবদার এড়াইতে পারিলেন না। কাকিমার নিমরাজ ভাব বুঝিয়া সুচতুর বউমা কালবিলম্ব করিলেন না, তখনই বড় পাত্রে ভরা নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া কাকিমার হাতে দিলেন; বউমার এইরূপ ক্ষিপ্র আয়োজনে কাকিমার আর 'না-না' বলিবার উপায় রহিল না। অনন্যোপায় হইয়া পাত্র লইয়া উপবিষ্ট বধূদিগকে মিষ্টান্ন কিছু কিছু পরিবেশন করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিলেন। মিষ্টান্নে যদি কিছু প্রাণনাশক মিশ্রিত থাকে সকলেরই তাহা অনিষ্টকর হইবে— পরিবেশনে কাকিমার এই সন্দেহমূলক অভিপ্রায় গূঢ় ছিল, তৎক্ষণাৎ বউমারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সংকল্পভঙ্গন হইল, সন্দেহভঙ্গন হয় নাই। সন্দেহ দুরতিক্রম্য।

বলেন্দ্রনাথের বিবাহে জননী প্রফুল্লময়ী দেবী ছোট জায়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"বলুর বিবাহে খুব ঘটা হইয়াছিল।··· আমার ছোট জা

মৃণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানারকম ভাবে সাহায্য করেন। তিনি আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালবাসিতেন। মনটা খুব সরল ছিল, সেইজন্য বাড়ির সকলেই তাঁকে খুব ভালোবাসিতেন।"

পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার্থ গৃহবিদ্যালয়ের পত্তন করিয়া কবি যখন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া মৃণালিনী দেবী কর্মচারীদিগের জন্য জমিদারী কাছারিতে পাঠাইয়া দিতেন। কখনো কোনো কোনো বিশিষ্ট কর্মচারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া কুঠিবাড়িতে খাওয়াইতেন। স্বভাব অব্যভিচারী।

বন্ধুবান্ধব লইয়া খাওয়াদাওয়ার আমোদ কবির স্বভাবে ছিল বড় কম না। একদিন প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে কবি মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক তিনি যে কেবল পত্নীকে এ কথা বলিতে ভুলিয়াছিলেন তাহা নয়, মধ্যাহ্নভোজনকালে তাঁহারও এ কথা স্মরণ হয় নাই। যথাকালে পরিবারবর্গের সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হইল। ভোজনান্তে কবি নিজকক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নিমন্ত্রিত প্রিয়নাথ কবির বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিবামাত্র আপনার বিষম ভ্রমের কথা কবির মনে হইল। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া পত্নীকে নিমন্ত্রিত বন্ধুর উপস্থিতি জানাইলেন। স্থিরবুদ্ধি কবিপত্নী বন্ধুর সহিত কথাপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। রন্ধনকুশল ক্ষিপ্র হস্তে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন এবং ভোজনপাত্রে সাজাইয়া বন্ধুকে ভোজনগৃহে আনিবার জন্য কবিকে সংবাদ দিলেন। বন্ধুর সহিত ভোজনগৃহে আসিয়া কবি দেখিলেন, পাত্র পূর্ণ, ভোজ্যের কোনো অংশেই ত্রুটি হয় নাই, সবই প্রস্তুত। দেখিয়াই কবি মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া গৃহিণীপনার সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন। বন্ধু ভোজন করিলেন। নিপুণ গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তায় গৃহীর নিমন্ত্রণ-বিভ্রাট ধরা পড়িল না, গৃহিণীর ইহাই দক্ষতা। কবি বলিয়াছেন—'সা ভার্যা যা গৃহে দক্ষা।'

বন্ধুসংখ্যা অল্প হইলেও কবির গৃহে বন্ধুসমাগম অল্প হইত না। এইরূপ ভ্রান্তিমূলক নিমন্ত্রণ-বিভ্রাট কবির এই একবারই মাত্র নহে ; কবির ভাব বুঝিয়াই মৃণালিনী দেবী নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, বন্ধুসমাগমে আর খাদ্য-বিভ্রাট ঘটিত না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কবির প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায়ই

আসিতেন, সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে 'কাকিমা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে' এই আবদার করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিতেন। কাকিমা অপ্রস্তুত থাকিতেন না, সস্নেহ বাক্যে পাত্র-ভরা খাদ্যে চিত্তরঞ্জনের চিত্তরঞ্জন করিতেন। এই স্নেহের দৃশ্য বড়ই মধুর!

কবি ও লোকেন্দ্রনাথ একই সময়ে বিলাতে মর্লি সাহেবের ছাত্র ছিলেন, সহপাঠিত্বে তাই উভয়ের সৌহৃদ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির সঙ্গে দেখা করিতে লোকেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসিতেন, সুহৃৎ-পত্নী যথোচিত সমাদরে আতিথ্য করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন।

উদার স্বভাব পক্ষপাতহীন। বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ কাকিমার কাছে থাকিতেই ভালবাসিতেন; তাঁহাদের প্রতি কাকিমারও পুত্রবৎ স্নেহ ছিল। অকৃত্রিম স্নেহ এমনই মনোমোহন।

সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ে মৃণালিনী দেবীর নৈপুণ্য ছিল স্বাভাবিক। পূজার সময়ে (?) সত্যেন্দ্রনাথের পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটক একবার অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের নারায়ণীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন মৃণালিনী দেবী। পূর্বে তিনি কখনো অভিনয় করেন নাই। নারায়ণীর ভূমিকা নাকি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় লিখিয়াছেন—থিয়েটারের অভিনেতা, অভিনেত্রীরা পার্কস্ট্রীটের বাড়ির অভিনয় দেখিয়া যায়, এবং কয়েক দিন পরে এমারেল্‌ডে যে অভিনয় হয় তাহাতে অভিনেত্রীরা ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ের ঢং আশ্চর্যরূপে অনুকরণ করিয়াছিল।

বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠে বিদ্যালাভের বেদনা কবির মনে সততই জাগরূক ছিল। শিক্ষায় গতানুগতিকতার অনুবর্তনে তাঁহার কিছুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। আদর্শ শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ তাই স্বীয় আদর্শে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়া শান্তিনিকেতনে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে আদর্শ বিদ্যালয়—ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। শিলাইদহে যে আদর্শে কবি গৃহবিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এই আশ্রম তাহারই পূর্ণ পরিণত প্রতিষ্ঠান। মহর্ষির দীক্ষা-গ্রহণের দিন ৭ই পৌষ, আশ্রমপ্রতিষ্ঠা-হেতু কবিবরেরও জীবনেতিহাসের স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিবস।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার সময় কবির বিশেষ অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। ঋণগ্রস্ত হইয়া

তিনি বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন। পুরী-স্থিত পাকা বাড়ি এই সময়ে তিনি আশ্রম-রক্ষণার্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন। অলংকার বিক্রয় করিয়া মৃণালিনী দেবী বিদ্যালয়ের পরিচালনায় কবির সহায়তা করিয়াছিলেন। সংকল্প সাধনার ব্যবসায় মহত্তেরই প্রকৃতিসিদ্ধ।

অর্থাভাব বিষয়ে পত্নীকে লিখিত কবির পত্রাংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিলাম: "দেখচ, মনে মনে কত উপার্জনের উপায় করছি। সকালে উঠেই বই লিখতে বসেছি, তাতে কত টাকা হবে একবার ভেবে দেখ। ছাপাবার সকল খরচ না উঠুক, নিদেন দশ-পঁচিশ টাকা ত উঠবে। এই রকম উঠে পড়ে লাগলে তবে টাকা হয়। তোমরা ত কেবল খরচ কর্তে জান— এক পয়সা ঘরে আনতে পার ?"

আশ্রমের কার্যে কবির সহধর্মিণী সহকর্মিণী হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ছাত্রগণের করণীয় সকল বিষয় তত্ত্বাবধান তিনি অবশ্যকর্তব্য মনে করিতেন। পাছে বালকগণের কষ্ট হয়, এই ভাবিয়াই তিনি তাহাদের খাওয়ার ও জলখাবারের ভার নিজের হাতেই লইয়াছিলেন ও দেখিয়া-শুনিয়া খাওয়াইতেন। এই অপত্যনির্বিশেষ স্নেহ তাঁহাকে বালকগণের মাতৃস্থানীয়া করিয়া রাখিয়াছিল। বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে এক আত্মীয়ের নিকটে শুনিয়াছিলাম—"আশ্রমের অধ্যাপকগণ ও বালকেরা যে প্রকার সুখে বাস করেন বাবুদের ভাগ্যেও তাহা সম্ভব হয় না। রথীন্দ্রনাথের মনস্বিনী জননী প্রতিদিনই আশ্রমবাসীদের জন্য নিজের অভিমত নানা আহার্যের ব্যবস্থা করেন, কোনো বিষয়েই ত্রুটি হয় না।"

ভ্রাতৃভাব শিষ্টাচার সংযম নিয়মনিষ্ঠা বিলাসবর্জন প্রভৃতি আশ্রমের আদর্শভূত সদ্‌গুণে বালকগণকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়া গড়িয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করার নিমিত্ত মৃণালিনী দেবী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহার তীব্র আঘাত তাঁহার অনভ্যস্ত শরীরবন্ধ সহ্য করিতে পারিল না, ফলে স্বাস্থ্যভঙ্গ দেখা দিল এবং ক্রমে সাংঘাতিক রোগে পরিণত হইল। চিকিৎসার্থে তিনি কলিকাতায় নীত হইলেন; সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসায় মারাত্মক রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না; সাংঘাতিক আক্রমণে আশ্রমজননীর জীবিতকাল ক্রমে নিঃশেষ হইল।

'ধরার সঙ্গিনী'র সঙ্গ সাঙ্গ হইল! শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্যা জামাতায় সাজানো সোনার সংসার ভাঙিয়া গেল— গৃহস্থতার অবসান হইল।

প্রায় দুই মাস মৃণালিনী দেবী শয্যাশায়িনী ছিলেন। রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কবি এই দীর্ঘকাল পীড়িত পত্নীর যেরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা কদাচিৎ কোনো সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতীর ভাগ্যে সম্ভব হয়। অর্থ-বিনিময়ে সেবাকারিণীর অসদ্ভাব তখন না হইলেও, তাদৃশ ব্যবস্থায় পাছে কোনো ত্রুটিতে রোগিণীর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, এই সন্দেহেই জীবনান্ত পর্যন্ত কবি পত্নীর সেবাশুশ্রূষা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক পাখা তখন ছিল না, হাতপাখার বাতাসে দিনের পর দিন কবি রোগিণীর রোগজ্বালা প্রশমিত করিয়াছিলেন। পতি-পত্নীর প্রণয়বন্ধনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত জীবনান্ত পর্যন্ত কবির এই অক্লান্ত সেবা।

১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ রবিবারে নিশীথসময়ে মৃণালিনী দেবী পরলোকগমন করেন। পত্নীর জীবিতাবসানের পরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া কবি একাকী ছাদে চলিয়া যান; সমস্ত রাত্রি ছাদেই কাটিয়া যায়। পুত্রবধূর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া মহর্ষি বলিয়াছিলেন—"রবির জন্য চিন্তা করি না, সে লেখাপড়া নিয়ে দিন কাটাতে পারবে। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যই দুঃখ হয়।"

মৃণালিনী দেবী যখন শয্যাগত, সেই সময়ে তাঁহার পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহাকে দেখিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সপত্নী হইলেও মৃণালিনী দেবীর প্রতি আপন পিসিমার মতই তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। সেই সময় ভাইঝি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"পিসিমা, আমি শয্যাগত, ছেলে-মেয়েদের বড় কষ্ট হচ্ছে। তাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই, তাদের ভার নিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।" পিসিমা ভাইঝির কথা রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি সংসারে থাকিয়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনে কবির নূতন বাড়িতে সংসারের ভার লইয়া তিনি শিশুদের প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়াছি। মীরা শমী তখন শিশু।

পত্নীর পরলোকগমনে কবির প্রণয়প্রবণ হৃদয়ে বিচ্ছেদবেদনা যে নিদারুণ আঘাত দিয়াছিল, পত্নীস্মরণে রচিত 'স্মরণ'-এর সন্তাপময়ী ভাবার কবিতায় পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তাহা অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু'চারিটি
স্মৃতির খেলেনা ক'টি বহুযত্নভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।
যে প্রবল কালস্রোতে প্রলয়ের ধারা
ভাসাইয়া যায় কত রবিচন্দ্র তারা
তারি কাছ হতে তুমি বহু ভয়ে ভয়ে
এই কটি তুচ্ছ বস্তু চুরি করে লয়ে
লুকায়ে রাখিয়াছিলে,— বলেছিলে মনে
অধিকার নাই কারো আমার এ ধনে!
আশ্রয় আজিকে তারা পাবে কার কাছে?
জগতের কারো নয়, তবু তারা আছে!
তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ?

২৮ পৌষ।
বোলপুর

'স্মরণ'-এর একটি কবিতা

কবিপত্নী

মন্মথনাথ ঘোষ

যশোহর জিলার অন্তর্গত দক্ষিণডিহিতে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বেণীমাধব রায়চৌধুরী। পিতৃগৃহে ইঁহার নাম ছিল ভবতারিণী, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবাহের পর ইঁহার নূতন নামকরণ হয় মৃণালিনী, এবং এই নামেই তিনি সুপরিচিতা ছিলেন। বিবাহের সময় তিনি ক্ষীণকায়া ছিলেন। বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের পত্নী নীপময়ী তাঁহার স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির ভার লন। তাঁহার কন্যা প্রতিভা দেবী (লেডি চৌধুরী) প্রভৃতির সহিত তাঁহার শিক্ষাকার্য অগ্রসর হয় এবং তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজি গল্প গ্রন্থাদি তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। সংগীতেও তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং বালক-বালিকাগণের ক্রীড়ায় যোগদান করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়ার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি মহিলাগণের শিল্প-মেলায় অনেকবার অভিনয়ে যোগদান করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। একবার 'রাজা ও রানী'র অভিনয়ে তিনি ব্রাহ্মণীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়া-ছিলেন। তিনি কখনও কোনও রচনা লিখিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় স্বর্ণকুমারী বলেন যে, তাঁহার স্বামী বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, সেইজন্য তিনি স্বয়ং কিছু লেখা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

স্মৃতিকথা ১

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবিকাকার বিয়ে আর হয় না; সবাই বলেন 'বিয়ে করো— বিয়ে করো এবারে', রবিকাকা রাজী হন না, চুপ করে ঘাড় হেঁট করে থাকেন। শেষে তাঁকে তো সবাই মিলে বুঝিয়ে রাজী করালেন। রথীর মা যশোরের মেয়ে। তোমরা জানো ওঁর নাম মৃণালিনী, তা বিয়ের পরে দেওয়া নাম। আগের নাম কী একটা সুন্দরী না তারিণী দিয়ে ছিল, মা তাই বলে ডাকতেন। সেকেলে বেশ নামটি ছিল, কেন যে বদল হল। খুব সম্ভব, যতদূর এখন বুঝি, রবিকাকার নামের সঙ্গে মিলিয়ে মৃণালিনী নাম রাখা হয়েছিল।

গায়েহলুদ হয়ে গেল। আইবুড়োভাত হবে। তখনকার দিনে ও বাড়ির কোনো ছেলের গায়েহলুদ হয়ে গেলেই এ বাড়িতে তাকে নেমন্তন্ন করে প্রথম আইবুড়োভাত খাওয়ানো হত। তার পর এ-বাড়ি ও-বাড়ি চলত কয়দিন ধরে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন। মা গায়েহলুদের পরে রবিকাকাকে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন করলেন। মা খুব খুশি, একে যশোরের মেয়ে, তায় রথীর মা মার সম্পর্কের বোন। খুব ধুমধামে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রবিকাকা খেতে বসেছেন উপরে, আমার বড়োপিসিমা কাদম্বিনী দেবীর ঘরে, সামনে আইবুড়োভাত সাজানো হয়েছে— বিরাট আয়োজন। পিসিমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমাদের নিজের চোখে দেখা। রবিকাকা দোড়দার শাল গায়ে, লাল কি সবুজ রঙের মনে নেই, তবে খুব জমকালো রঙচঙের। বুঝে দেখো, একে রবিকাকা, তায় ওই সাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লির বাদশা! তখনই ওঁর কবি বলে খ্যাতি, পিসিমারা জিজ্ঞেস করছেন, কি রে, বউকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে, কেমন হবে বউ, ইত্যাদি সব। রবিকাকা ঘাড় হেঁট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন, আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই। সে মূর্তি তোমরা আর দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না বললে— ওই আমরাই যা দেখে নিয়েছি।

স্মৃতিকথা ২

ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

ছেলেবেলার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ ছিল রবিকাকার কনে দেখতে যশোর যাওয়া। কন্যাযাত্রীর মধ্যে (একরকম ঘুরিয়ে আমাদের ঐ নাম দেওয়া যেতে পারে) বড়রা ছিলেন মা, জ্যোতিকাকামশায়, নতুন কাকিমা, রবিকাকা; ছোটদের মধ্যে আমরা দুই ভাইবোন ফাউ। আমার মামার বাড়ি নরেন্দ্রপুরে সেই প্রথম (ও শেষ) যাওয়া। একটু একটু মনে পড়ে মাটির আঙিনার চার পাশে একচালা মাটির খোড়ো ঘর ও উঁচু রোয়াক। তার চার দিকে বাগান ও হয়ত পুকুর। তখনকার একটি সামান্য ঘটনা কিরকম মনে আছে, আশ্চর্য! আমরা বাইরে খেলা করছি, এমন সময় কাকারা ঘরের ভিতর থেকে ডেকে জানতে চাইলেন কটা বেজেছে। আমি ঘড়ি দেখার অক্ষমতা স্বীকার করায় তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভিতরে ডেকে নিয়ে আমাকে ঘড়ি দেখতে শিখিয়ে দিলেন। কনে দেখতে মেয়েরাই প্রায় যেতেন; আমরা সঙ্গে যেতুম কিনা মনে পড়ছে না। যশোর পিরালী ব্রাহ্মণদের একটি আড্ডা ছিল, তাই জোড়াসাঁকোর বউরা অধিকাংশ সেখান থেকেই আসত। তাদের সুন্দর বলে একটা নামও ছিল, যদিও পুরনো দাসীদের পাঠিয়েই পছন্দ করা হত। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ও পিতৃবন্ধু মনোমোহন ঘোষের বোনেরা পরে আমাদের কাছে গল্প করেছেন যে, মাকে ষোলো বছর বয়সে বাবা যখন তাঁদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে নিয়ে যান, তখন বসবার ঘরে গিয়ে তাঁদের মনে হল যেন তিনি ঘর আলো করে বসে আছেন। রবিকার বেলা নির্বাচকমণ্ডলী খুব জোর ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন বোধ হয় যশোরের সুন্দরীকুল উজাড় হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা দক্ষিণডিহি চেঙট প্রভৃতি সব পাড়া খুঁজেও মনের মত মেয়ে পেলেন না। অবশেষে যার সঙ্গে কথা ঠিক করলেন তিনি ফুলতলার বেণী রায়ের মেয়ে— যিনি জোড়াসাঁকোর দপ্তরে কাজ করতেন। নাম ছিল ভবতারিণী। বিয়ের পর সেটি বদলে মৃণালিনী করে দেওয়া হল, বোধ হয় রবির সঙ্গে

মিলিয়ে। কাকিমা দেখতে ভাল ছিলেন না, কিন্তু খুব মিশুক ও পরকে আপন করবার ক্ষমতা ছিল, যেটা আমি বলি যশুরে মেয়েদের সাধারণ গুণের মধ্যে।... রবিকাকার মত অমন গুণবান্, রূপবান্, ভাগ্যবান্, ধনবান্, খ্যাতিমান্ (ভবিষ্যতের মত অত না হলেও যথেষ্ট) যুবাপুরুষ, গুরুজনরা যে মেয়েকে হাতে তুলে দিলেন, বিনা বাক্যব্যয়ে নির্বিবাদে কী করে তাকেই বিয়ে করতে রাজি হলেন ও পরে সুখেস্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগলেন, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অথচ আজকাল কত কথা শোনা যায় যে, স্ত্রী শিক্ষিতা না হলে শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে মিশ খাবে কী করে ইত্যাদি। সেকালে ওঁদের স্ত্রীরা সে হিসেবে কে-ই বা স্বামীর উপযুক্ত ছিলেন? অথচ ওঁরা সর্বদা তাঁদের যথেষ্ট মেনে চলতেন ও গৃহলক্ষ্মীর সম্মান দিতেন।

স্মৃতিকথা ৩

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা লেখা নিয়ে তাঁর ঘরেই থাকতেন। যখন লিখতেন, তাঁর ঘরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল। রবিবার সকালে দিদিকে ও আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠাতেন। সেদিন ঘড়িতে দম দেবার দিন। প্রথমে দম দিতেন সর্বদা ব্যবহার করতেন যে সোনার পকেট-ঘড়ি তাতে। সেটা তাঁর বিয়েতে যৌতুক-পাওয়া ঘড়ি। দু দিকে তার ডালা, একটা বোতাম টিপলে টুক করে ডালা খুলে যেত। ডালার ভিতর পিঠে R. T. খোদাই করা। কয়েক বছর পরে বাবা এই ঘড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হন। তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় খুলেছেন। হাতে নেই টাকা, একে একে জিনিসপত্র সব, মায় নিজের বইয়ের লাইব্রেরি বিক্রি করে সেখানে ছাত্রাবাস তৈরি হতে লাগল। অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী (আমাদের বাড়ির সকলে তাঁকে লাহোরিনী বলে ডাকতেন) বাবার কাছ থেকে এই ঘড়িটি কিনলেন। তার অনেক বছর পরে আমার বিয়ের সময় তিনি আমাকে যখন যৌতুক হিসাবে হাতে একটি বাক্স দিলেন, তার ডালা খুলে অবাক্ হয়ে দেখলুম বাবার সেই ঘড়ি তার ভিতর রয়েছে। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। ঘড়িটি এখন রবীন্দ্রসদনে।...

বাবা ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে লেখাপড়া নিয়ে, মা ছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসারের কাজে। সেইজন্য ছেলেবেলার কথা মনে করতে গেলে মায়ের কথাই বেশী মনে পড়ে। তাঁর নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু তাঁর সংসার ছিল সুবৃহৎ। বাড়ির ছোটোবউ হলে কি হয়, জোড়াসাঁকো-বাড়ির তিনিই প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। কাকিমার কাছে সকলেই ছুটে আসত তাদের সুখদুঃখের কথা বলতে। সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল, তিনি ছিলেন সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের সুখে সুখী। তাঁকে কোনো দিন কর্তৃত্ব করতে হয়নি, ভালোবাসা দিয়ে সকলের মন হরণ করেছিলেন। সেইজন্য ছোটোরা যেমন তাঁকে ভালোবাসত, বড়োরা তেমনি স্নেহ করতেন। সকলের

মধ্যে বলুদাদা তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মা কখনো ইস্কুলে লেখাপড়া শেখেননি— বাবার কাছেই মা শিক্ষা পেয়েছিলেন। অল্পবয়স থেকেই বলুদাদা সাহিত্যরসে মাতোয়ারা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজিতে যখন যে-কোনো বই পড়তেন, কাকিমাকে সেগুলি একবার পড়ে না শোনালে তাঁর তৃপ্তি হত না। বলুদাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল। বলুদাদা আমাকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতো খুব স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন আমার বালক-বয়সের আদর্শ পুরুষ। সব সময়েই তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরতুম। মা স্নান করিয়ে দিতেন, কিন্তু প্রসাধন করতে যেতুম বলুদাদার কাছে।…

শান্তিনিকেতনে নিজেদের বাসের জন্য পৃথক্ বাড়ি তখন ছিল না, আমরা থাকতুম আশ্রমের অতিথিশালার দোতলায়। রান্নাবাড়ি ছিল দূরে। মা রান্না করতে ভালোবাসতেন, তাই দোতলার বারান্দার এক কোণে তিনি উনুন পেতে নিয়েছিলেন। ছুটির দিন নিজের হাতে রেঁধে আমাদের খাওয়াতেন। মা নানারকম মিষ্টান্ন করতে পারতেন। আমরা জানতুম, জালের আলমারিতে যথেষ্ট লোভনীয় জিনিস সর্বদাই মজুত থাকত—সেই অক্ষয় ভাণ্ডারে সময়ে অসময়ে সহপাঠীদের নিয়ে এসে দৌরাত্ম্য করতে ত্রুটি করতুম না। বাবার ফরমাশমতো নানারকম নতুন ধরনের মিষ্টি মাকে প্রায়ই তৈরি করতে হত। সাধারণ গজার একটি নতুন সংস্করণ একবার তৈরি হল, তার নাম দেওয়া হল 'পরিবন্ধ'। এটা খেতে ভালো, দেখতেও ভালো। তখনকার দিনে অনেক বাড়িতেই এটা বেশ চলন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন বাবা যখন মাকে মানকচুর জিলিপি করতে বললেন, মা হেসে খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু তৈরি করে দেখেন এটাও উৎরে গেল। সাধারণ জিলিপির চেয়ে খেতে আরো ভালো হল। বাবার এইরকম নিত্য নতুন ফরমাশ চলত, মা-ও উৎসাহের সঙ্গে সেইমতো করতে চেষ্টা করতেন।

কলকাতায় মা আত্মীয়স্বজনের স্নেহবন্ধনের মধ্যে একটি বৃহৎ পরিবারের পরিবেশের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে সকলেই ভালোবাসত, জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনিই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্রী ছিলেন। সেইজন্য কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে এসে থাকা তাঁর পক্ষে আনন্দকর হয়নি। অস্থায়িভাবে অতিথিশালার কয়েকটা ঘরে বাস করতে হল, সেখানে গুছিয়ে সংসার পাতার



রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী

কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে সেটা যতই কষ্টকর হোক তিনি সব অসুবিধা হাসিমুখে মেনে নিয়ে ইস্কুলের কাজে বাবাকে প্রফুল্লচিত্তে সহযোগিতা করতে লাগলেন। তার জন্য তাঁকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। যখনই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নিজের অলংকার একে একে বিক্রি করে বাবাকে টাকা দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত হাতে সামান্য কয়েকগাছা চুড়ি ও গলায় একটি চেন ছাড়া তাঁর কোনো গয়না অবশিষ্ট ছিল না। মা পেয়েছিলেন প্রচুর, বিবাহের যৌতুক ছাড়াও শাশুড়ির পুরানো আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের খরচ জোগাতে সব অন্তর্ধান হল। বাবার নিজের যা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল তা আগেই তিনি বেচে দিয়েছিলেন। যে বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা তাঁর সাময়িক শখের জিনিস ছিল না। বহুদিন ধরে যে-শিক্ষার আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে কল্পনার আকারে ছিল তাকেই রূপ দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। তিনি কেবল আদর্শবাদী ছিলেন না, আদর্শকে রূপায়িত না করতে পারলে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা, যতই তা কঠিন হোক-না কেন, তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। সেই ত্যাগ স্বীকারে মা তাঁর অংশ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের আত্মীয়েরা মাকে এইজন্য ভৎ‌সনা করতেন, বাবাকে তো তাঁরা কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিবেচক মনে করতেন। বহুকাল পর্যন্ত বাবাকে, আর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁকে, বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধতা সহ্য করতে হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে কয়েক মাস থাকার পর মায়ের শরীর খারাপ হতে থাকল। যখন নিতান্তই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল। বাবা তখন কলকাতায়, দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথকে লিখলেন মাকে নিয়ে কলকাতায় আসতে। বোলপুর থেকে কলকাতায় মাকে নিয়ে সেই যে যাওয়া— আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে একটি সামান্য কারণে। মা শুয়ে আছেন, আমি তাঁর পাশে বসে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে দেখছি— কত তালগাছের শ্রেণী, কত বুনো খেজুরের ঝোপ, কত বাঁশঝাড়ে ঘেরা গ্রামের পর গ্রাম, কখনো চোখে পড়ল মস্তবড়ো মহিষের পিঠে নির্ভয়ে বসে আছে এক বাচ্চা ছেলে— এইসব গ্রাম্য দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো চলে যাচ্ছে। একসময়ে নজরে পড়ল [illegible]

মাঠের মাঝে ভাঙা-পাড় অর্ধেক বোজা একটি পুকুর— তার যেটুকু জল আছে, ঢেকে গেছে অসংখ্য শাদা পদ্মফুলে। দেখে এত ভালো লাগল, মাকে ডেকে দেখালুম। তার পর কত বছর গেছে, প্রতিবারই বোলপুর-কলকাতা যাতায়াতের সময় সেই পদ্মপুকুর দেখার চেষ্টা করি। কেবল দেখতে পাই— পুকুরে জল নেই, মাটি ভরে মাঠের সঙ্গে পুকুর সমান হয়ে গেছে, পদ্ম সেখানে আর ফোটে না।

কলকাতায় এসে মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা কী অসুখ ধরতে না পারায় বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাতে লাগলেন। তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা— প্রতাপ মজুমদার, ডি. এন. রায় প্রভৃতি সর্বদাই বাড়িতে আসতে থাকলেন। তাঁরা সকলেই বাবাকে সমীহ করতেন, এমন-কি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁদের সমকক্ষ মনে করতেন। মায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁরা ব্যবস্থা দিতেন। এঁদের চিকিৎসা ও বাবার অক্লান্ত সেবা সত্ত্বেও মা সুস্থ হলেন না। আমার এখন সন্দেহ হয় তাঁর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল। তখন এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা ছিল না, অপারেশনের প্রণালীও আবিষ্কৃত হয়নি।

মৃত্যুর আগের দিন বাবা আমাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যাপার্শ্বে তাঁর কাছে বসতে বললেন। তখন তাঁর বাক্‌রোধ হয়েছে। আমাকে দেখে চোখ দিয়ে কেবল নীরবে অশ্রুধারা বইতে লাগল। মায়ের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমাদের ভাইবোনদের সকলকে সে রাত্রে বাবা পুরানো বাড়ির তেতলায় শুতে পাঠিয়ে দিলেন। একটি অনির্দিষ্ট আশঙ্কার মধ্যে আমাদের সারা রাত জেগে কাটল। ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে বারান্দায় গিয়ে লালবাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা, নিস্তব্ধ, নিঝুম; কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। আমরা তখনি বুঝতে পারলুম আমাদের মা আর নেই, তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সমবেদনা জানাবার জন্য সেদিন রাত পর্যন্ত লোকের ভিড়। বাবা সকলের সঙ্গেই শান্তভাবে অসম্ভব ধৈর্যের সঙ্গে কথা বলে গেলেন, কিন্তু কী কষ্টে যে আত্মসংবরণ করে তিনি ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারছিলুম। একমাস ধরে তিনি অহোরাত্র মার সেবা করেছেন, নার্স রাখতে দেননি, শ্রান্তিতে শরীর মন ভেঙে পড়ার কথা। তার উপর শোক। যখন সকলে চলে গেল, বাবা

আমাকে ডেকে নিয়ে মায়ের সর্বদা-ব্যবহৃত চটিজুতো জোড়াটি আমার হাতে দিয়ে কেবলমাত্র বললেন, 'এটা তোর কাছে রেখে দিস, তোকে দিলুম।' এই দুটি কথা বলেই নীরবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। মায়ের চটি এখন রবীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই আমরা শান্তিনিকেতনে চলে এলুম। বাবা বিদ্যালয়ের কাজে আরো যেন মন ঢেলে দিলেন। কাজের ফাঁকে নিভৃতে বসে শোকদগ্ধ হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করলেন গুটিকতক কবিতায়—যা বই আকারে পরে বেরিয়েছিল 'স্মরণ' নাম দিয়ে।

স্মৃতিকথা ৪

মীরা দেবী

আমার মার রান্নার সুনাম ছিল। বাবা রান্নায় ও শরবতে নানারকম **experiment** করতে ভালোবাসতেন ও সেগুলি মাকে দিয়ে করাতেন। এক সময় বাবা শিলাইদহে থাকতে আচার্য জগদীশ বসু ও নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রায় যেতেন ও পদ্মায় আমাদের বোটে থাকতে খুব ভালোবাসতেন।…

জগদীশবাবুরা যখনি যেতেন বাবা মাকে দিয়ে একটা করে নতুন রকম রান্না করাতে ভালোবাসতেন ও তাঁরা সেগুলি খুব খুশী হয়ে খেতেন। পরে বড় হয়ে তাঁদের মুখে মায়ের রান্নার প্রশংসা শুনেছি।

মাকে আমার একটু আধটু যা মনে পড়ে আবছায়া-মত। কিন্তু আমার স্মরণশক্তি যদি এত খারাপ না হত তা হলে আরো মনে থাকার কথা। শান্তিনিকেতনের পুরোনো guest house-এ আমরা ছিলুম। সেখানে সরু এক-ফালি বারান্দায় একটা তোলা উনুনে মোড়ায় বসে মা রান্না করছেন, তাঁর পিঠটা শুধু দেখা যাচ্ছে। কাছে তাঁর পিসিমা রাজলক্ষ্মী দিদিমা তরকারি কুটতে কুটতে গল্প করছেন।

আর একটা ছবি মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের দোতলার গাড়ি-বারান্দার ছাতে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মার হাতে একটা ইংরেজি নভেল। তার থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিদিমাকে পড়ে শোনাচ্ছেন। মার চোখ মুখ স্পষ্ট কিছু মনে নেই, শুধু একটা অবয়ব। গল্প শোনবার লোভে বোধ হয় তাঁদের গল্পের আসরে কখনো গিয়ে বসেছি। তাই বইটার একটি মেয়ের নাম কি করে যে মনের মধ্যে গাঁথা থেকে গিয়েছিল খুবই আশ্চর্য লাগে। আমার তখন ইস্টলিনের রোমান্সে আকৃষ্ট হবার বয়স নয়, তবু বোধ হয় মার গল্প বলার ধরনে তাঁর কণ্ঠস্বরে যে বেদনা ফুটে উঠত তাতে আমার তখনকার শিশুমনে একটা অজানা বেদনার ছাপ রেখে গিয়েছিল। তাই Barbara-র নামটা মনে ছিল।

কিছুদিন পরে মার অসুখ করল। তখন তাঁকে কলকাতায় আনা হল। এখন যেটাকে বিচিত্রা বলা হয় আমরা ঐখানে থাকতুম। তখন আমরা ঐ বাড়িকে হয় লাল বাড়ি নয় নতুন বাড়ি বলে বলতুম। বিচিত্রার লম্বা হল, তাকে তিনটে swinging partition দিয়ে তিনভাগ করা ছিল। তারি এক-একটা ঘরে আমরা থাকতুম। সব শেষের পশ্চিমের ঘরে মাকে রাখা হল নিরিবিলি হবে বলে। আমাদের বাড়ির সামনেই গগনদাদাদের বিরাট অট্টালিকা থাকায় নতুন বাড়ির কোনো ঘরে হাওয়া প্রবেশ করত না। তখন বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। মায়ের অসুস্থ শরীরে ঐরকম হাওয়া-বাতাসহীন ঘরে না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন। তবে বড় বৌঠান হেমলতা দেবীর কাছে শুনেছি বাবা মার পাশে বসে সারারাত তালপাখার বাতাস করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর

হেমলতা ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় শীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে। দিন-তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০। বিবাহ হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়িতে। বিয়ে করতে যেতে হয়নি তাঁকে শ্বশুরবাড়ি। পরিবারের বড় ছেলের ও ছোট ছেলের বিয়ে বাপ-মা'রা ঘটা করে দিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রথম কাজ ও শেষ কাজ বলে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের শেষ পুত্র। মা নাই—আড়ম্বরে উদাসীন পিতা তখন হিমালয়বাসী। বিয়েতে ঘটা করে কে। ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়াভাবে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ধুমধামের সম্পর্ক ছিল না তার মধ্যে। পারিবারিক বেনারসী শাল ছিল একখানি—যার যখন বিয়ে হত সেইখানি ছিল বরসজ্জার উপকরণ। নিজেরই বাড়িতে পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে— স্ত্রী-আচারের সরঞ্জাম যেখানে সাজানো। বরসজ্জার শালখানি গায়ে জড়ানো রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন পিঁড়ির উপর। নতুন কাকিমার আত্মীয়া— যাঁকে সবাই ডাকতেন 'বড় গাঙ্গুলির স্ত্রী' বলে— রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলেন তিনি। তাঁর পরনে ছিল একখানি কালো রঙের বেনারসী জরির ডুরে।

বিয়ের সময় কাকিমা ছিলেন খুব রোগা। গ্রামের বালিকা, শহুরে হাবভাব কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হচ্ছে ··· কত বড় আশ্চর্য মানুষ, কাকে তিনি পেলেন, এর কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না। কনে এনে সাত পাক ঘুরানো হল—শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদান-স্থলে। বাড়ির অবিবাহিত বড় মেয়েগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমিও জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। দালানের এক ধারে বসবার জায়গা ছিল আমাদের দেখলুম সেখানে বসে স্বচক্ষে কাকিমার সম্প্রদান।

সম্প্রদানের পর বরকনে এসে বাসরে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের বউ এসে তার থাকবার জন্যে একটি ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল আগে থেকেই। বাসর বসবে সেই ঘরেই। বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন। ভাঁড়-কুলো

খেলা আরম্ভ হল, ভাঁড়ের চালগুলি ঢালা-ভরাই হল ভাঁড়খেলা। রবীন্দ্রনাথ ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোট কাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠলেন,

ওকি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড়খেলা? ভাঁড়গুলো সব উল্টে পাল্টে দিচ্ছিস কেন?

রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি—নিজেই বর। তাঁকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়নি। তাই তাঁর লজ্জা সংকোচের কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

জানো না কাকিমা— সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে— কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ বাক্‌সিদ্ধ মানুষ, কথায় তাঁকে হারাতে পারবে না কেউ। তাঁর কাকিমা আবার বললেন,

তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে, তুই এমন গাইয়ে থাকতে?

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর তখন কি চমৎকার ছিল, সে যারা না শুনেছে বুঝতে পারবে না। আমরা যে কানে শুনেছি সে আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। এখন সবই হারিয়ে গেছে, তবু যা পেয়েছি তাই রেখেছি মনে ধরে।

বাসরে গান জুড়ে দিলেন—

আ মরি লাবণ্যময়ী
কে ও স্থির সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে
মার্জিত বদনখানি!
নেহারিয়া রূপ হায়,
আঁখি না ফিরিতে চায়,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী
কে রূপসী নাহি জানি।

দুষ্টুমি করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারী কাকিমা রবীন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে জড়োসড়ো। ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। আরও একটা গান তখন গেয়েছিলেন—সেটা আমার স্মরণ নাই। সেদিনকার পালা ওখানেই শেষ।

কাকিমা প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন—মাত্র ১ বৎসরের বড় আমার থেকে। তাই তাঁর সাথে আমাদের বেশ ভাব জমেছিল পরে। নানারকম ছেলেমানুষি গল্প হত খুব। নতুন কাকিমার এক বোনঝি নীরজা থাকতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, তিনিও আমাদের গল্পের দলের একজন। কাকিমার বিবাহের তিন মাস পরে আরেকটি ঘটনা না বলে পারছি না। ন'পিসিমার প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ীর বিবাহ। গায়েহলুদে দুপুরে আমরা নিমন্ত্রণে গিয়েছি। মধ্যাহ্নভোজনে বসতে প্রায় একটা বেজে গেল। খেয়ে উঠতে দুটো। সেই সময়ে কলকাতা মিউজিয়মে প্রদর্শনী খুলেছে নূতন। সেই প্রথম কলকাতায় প্রদর্শনীর প্রচলন। তিনটের সময় প্রদর্শনীতে যাবার জন্যে সকলে প্রস্তুত, আমরাও বাড়ি ফেরবার মুখে। মেজো কাকিমার সঙ্গে কাকিমাও যাবেন প্রদর্শনীতে। বাসন্তী রঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরির কাজ করা পাড়-বসানো শাড়ি পরেছেন কাকিমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। কথায় বলে বিয়ের জল গায়ে পড়লে মেয়েরা সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে। সেই রোগা কাকিমা দিব্যি দোহারা হয়ে উঠেছেন তখন। রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে এসে জুটলেন সেই সময় সেইখানে হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে খেতে খেতে। কাকিমাকে সুসজ্জিত বেশে দেখে দুষ্টুমি করে গান জুড়ে দিলেন তাঁকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে—

হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও,
আধো নয়নে সখি, চাও চাও!

এমন চড়া সুরে ধরেছেন যে জোর পৌঁছে যায় সবার কানে—

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো হে,
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে।
হৃদয়কাননে ফুল ফোটাও,
আধো নয়নে সখি, চাও চাও—
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো হে।

সংসারী রবীন্দ্রনাথ

হেমলতা ঠাকুর

সংগীতের স্বরসাধনায় ও কাব্যের ছন্দযোজনায় কবি যেমন বাঁধা পথ অনুসরণ করে চলেন নাই, সংসার-পরিচালনায়ও তেমনি সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাঁধা পথ ধরে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে চলতে দিতে চান নাই। কবিপত্নী ছেলেদের দামী পোষাক পরাতে গেলে কবি বোঝাতেন, বড়মানুষির আওতায় থাকলে ছেলে মানুষ হয় না, অভ্যাসে তার গলদ জমে ওঠে অনেক। তোমার সন্তানরা খুব ভালো করে যাতে মানুষ হয় তারই চেষ্টা করছি। শুনে কবিপত্নী খুশি হতেন, গৌরব অনুভব করতেন, কিন্তু মনে মনে লুকিয়ে থাকত ছেলেদের সুন্দর সুন্দর দামী পোষাকে সাজাবার সাধ। আশপাশের মানুষদের কাছে সেটি প্রকাশ হয়ে পড়ত দু-এক কথায়। তবে কার্যত তিনি স্বামীর আদর্শই অনুসরণ করে চলতেন।

সাধারণ লোকদের সাদাসিধা অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য কবি আগ্রহ প্রকাশ করতেন খুব— না পারলে মনে কষ্ট পেতেন ও খেদ করতেন। নিজেকে ভেঙে গড়তে চাইতেন তাদের মত অভ্যাসে অভ্যস্ত করার জন্য। বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন বলে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরি-বাড়ির এক পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেক দিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে— এক সঙ্গে একই খাদ্য।

কবিপত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড় ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ বেশেই থাকতে ভালোবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরো সাদাসিধা করে তুলেছিল।

বিলাস বর্জন, উপকরণ বর্জন একমাত্র বুলি ছিল সে সময় কবির মুখে। মেয়েদের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে রূপসৃষ্টি, চোখ-ধাঁধানো রঙ-বেরঙের প্রজাপতি প্যাটার্নের সাজসজ্জা ও অলংকারবহুলতার আড়ম্বরের প্রতি ধিক্কার দিতেন কবি প্রতি কথায়, বলতেন— অসভ্য দেশের মানুষরাই মুখ

'চিত্তির' করে। মুখে রঙ মেখে মেয়েরা কি অসভ্য দেশের মানুষ সাজতে চায়?

আমাদের ধরাধরিতে একদিন কবিপত্নী কানে দুটি দুল ঝোলানো বীরবৌলি পরেছিলেন, হঠাৎ কবি এসে পড়েন সেই সময় ঘরে, কবির প্রবেশ-মাত্র লজ্জা পেয়ে তিনি দুই কানে দুই হাত চাপা দিলেন। টানাটানি করে আমরা হাত নামাতে পারলাম না কিছুতেই। তিনি এত কম গহনা ব্যবহার করতেন যে দুটি বীরবৌলি কানে পরেই লজ্জা পেলেন খুব বেশি। সমবয়সী বৌদের সাজতে বলবেন কিন্তু নিজে সাজবেন না এই ছিল তাঁর ভাব। 'বড় বড় ভাসুরপো ভাগ্নেরা চারি দিকে ঘুরছে— আমি আবার সাজব কি'—তাঁর নিজের মুখের কথা।

কবি, পিতার শেষ সন্তান, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় ও সমবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল তাঁর কয়েকজন।

কবিপত্নী একবার সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে— লজ্জার কথা! তোমাদের চমৎকার রুচি! কবিপত্নী সে বোতাম ভেঙে ওপাল-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু-চার বার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে। কবির পছন্দ সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র—বুঝতে সময় লাগে।

বিদ্যালয়-সূচনার পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সাবেক বড় কুঠিটিতে কবির পরিবার ও আমরা একত্র বাস করেছি অনেক সময়। গৃহস্থালির ভার থাকত কবিপত্নীর, তাঁকে গৃহকর্মে সাহায্য করার ভার আমার। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ, ব্যয়ের হিসাব রাখার ভার আমার স্বামীর। খাওয়া হত চমৎকার, কবিপত্নীর রান্নার ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুতের বিরাম ছিল না একদিনও। কবি থেকে থেকে পত্নীকে বলতেন, "নীচে বসে লিখতে লিখতে রোজ শুনি, চাই ঘি, চাই সুজি, চিনি চিঁড়ে ময়দা, মিষ্টি তৈরি হবে। যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে খুব।" আমার স্বামীর নাম করে বলতেন, "সে তো কখনো 'না' বলবে না। যত চাইবে ততই দেবে। তার মত কর্তা ও তোমার মত গিন্নী হলেই হয়েছে আর কি, দু-দিনে ফতুর।" কবিপত্নী ভাসুরপুত্রের (আমার স্বামীর) নাম করে বলতেন, "সে সংসার

ঝুমুর

সাগর, অরণ্য, পাহাড়
দেখেছি, পাহাড় দেখে আমরা
সকলে অবাক হয়েছি, এত বড়
পাহাড় কখনো দেখিনি। সং
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
নীল সবুজ খুব [illegible] হবে। [illegible]
এখানে [illegible] [illegible] যে [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নেই
এ রকম অপূর্ব এ রকম সব
ও [illegible] কোনো কি রকম তুমি [illegible]
[illegible] যে বলো [illegible]।

সুশীলা, সুধা, কুতী; দিনু, নলিনী
এখানে আছে, আমাদের দলটী
বেশ জমেছে। আমরা মনে
করেছিলুম যে তুমি হয়ত এদিক
দিয়ে বম্বের হয়ে যেতে পার।
আমরা তোমাকে চিঠি-লিখব
মনে করেছিলুম তোমার ওখানে
যাবার জন্যে, কিন্তু শেষ কালে
দেখলুম জাহাজের দোষে
যেতে সুবিধা নেই।

মৃণালিনী

মৃণালিনী দেবীর একটি চিঠি

বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করে সুখ, তোমার এদিকে নজর দেওয়া কেন।”…

কবিপত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার। ব্যঞ্জনাদির স্বাদ ও মিষ্টান্নাদির পাক তাঁর হাতে উৎরাত উৎকৃষ্ট হয়ে। কবির জন্য প্রায়ই তিনি ঘরে নানানতরো মিষ্টান্ন তৈরি করতেন নিজের হাতে। চিঁড়ের পুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই তাঁর হাতের একবার যাঁরা খেয়েছেন তাঁরা আর ভোলেন নাই। নাটোরের ভূতপূর্ব মহারাজা স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথ রায় কবিপত্নীর হাতের তৈরী দইয়ের মালপোর ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের শখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর শখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস করেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি শখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব করে বলতেন, “দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম।” তিনি চটে গিয়ে বলতেন, “তোমাদের সঙ্গে পারবে কে ? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।”

সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি, কবি নিজের ইচ্ছায় ভর করেই চলেছেন। জন্ম হতে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এইসব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন ; কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব বলেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন একথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট করে। ঘরের মানুষ—যাঁদের লক্ষ শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা। স্বল্পাহারের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা অনেক সময় কবি-পত্নীকে বলতাম, “বলুন না কাকিমা কাকা-মহাশয়কে বলকারক খাদ্য কিছু খেতে।” কবিপত্নী বলতেন, “তোমরা চেনো না ; বললে জেদ আরো বাড়বে ; না খেয়ে দুর্বল হয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা

ঘুরে পড়ুন আগে, তার পরে নিজেই শিখবেন—কারো শেখানো কথা শোনবার ধাতের মানুষ নন।"

কবি বহু বৎসর নিরামিষভোজী ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর ঘরে যখন কবি নিরামিষভোজী, এমনকি সময়ে সময়ে অন্নত্যাগ করে শুধু ছোলা ভিজানো, মুগডাল ভিজানো খেয়ে দিন কাটান, তখন কার্যসূত্রে মাঝে মাঝে কবিকে পতিসরে যেতে হত। কবির শাশুড়ী ঠাকুরানী তখন নিজগ্রাম যশোহর জেলার অন্তর্গত ফুলতলা ছেড়ে পুত্রের কর্মস্থান পতিসরে বাস করতেন। তিনি স্বহস্তে মাছের ব্যঞ্জনাদি রান্না করে জামাতার পাতে দিলে কবি 'না' বলতেন না। কন্যা নাই, পাছে তিনি মনে কষ্ট পান ভেবে নিজের ইচ্ছা সেখানে কবি খর্ব করতেন। সঙ্গের ভৃত্য উমাচরণ ফিরে এসে আমাদের কাছে গল্প করত, "এখানে বাবুমশায় খাওয়া নিয়ে এত গোলমাল করেন, পতিসরে কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুন যা দেন তাই খান ; একটি কথা বলেন না—শ্বাশুড়ী কিনা!"

ভৃত্যরা খুশী মনে সহজভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালোবাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।

শান্তিনিকেতন কুঠির দোতলায় একদিন বিকেলে চায়ের টেবিলে কবি চা খেতে বসেছেন, ঘরে ভালো মিষ্টি কাকামহাশয়ের জন্যে তৈরি করা হোক বলায় কবি হঠাৎ বলে ফেললেন, "ঘরের মিষ্টি আর আমার দরকার নাই।" বুঝলুম কাকিমার হাতের মিষ্টির কথা মনে পড়ে তাঁকে ব্যথা দিল। অন্তরের ব্যথা খুব চেপে রাখেন কবি, কেমন করে সেদিন কথাটুকু মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল।

এইবার উপকরণ-বর্জনের পালা। সংসার-সরঞ্জাম সব-কিছু ফেলে চলো যে-পথে কবি চলেন সেই পথে কবির সঙ্গে। সংসার-সঙ্গিনীর প্রতি এই ছিল তাঁর আর-এক দিকের আর-এক ভাবের কথা।

উপকরণের বোঝা বয়ে চলা সম্বন্ধে কবির মনে গভীর বিরাগ ছিল গোড়া থেকে। মনের চেতনা যাঁদের সূক্ষ্ম, উপকরণের ভার তাঁরা সইতে পারেন না, দুঃখ পান তাই নিয়ে। ঘরছাড়া কবি ঘর ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধতে গেছেন কয়েক বার। যাত্রাকালে কবির মুখে এক কথা— উপকরণ আবর্জনা ফেলে যাও, ওদের সঙ্গের সাথী কোরো না। ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য

জিনিস— বঁটি, কাটারি, কুরুনি, বারকোশ, কড়া, খুন্তি, হাতার বোঝাটি সঙ্গে যাচ্ছে দেখলেই কবি হুলুস্থুল বাধাতেন। চটে মটে বলতেন, "এ-সব জঞ্জাল জড়ো করা কেন?" যেন দুখানি বস্ত্র হাতে নিয়ে বেরোতে পারলেই ভালো হয় কবির মতে।

পথযাত্রায় গৃহস্থালি সরঞ্জাম দু-একটি বেশী সঙ্গে নেওয়ার দিকে মেয়েদের ঝোঁক, পুরুষদের দৃষ্টিতে যেগুলি অনাবশ্যক ঠেকে। বোঝা বাড়াও কেন, পুরুষদের কথা। সময়কালে অভাবে ঠেকতে না হয়, মেয়েদের ভাব। প্রায় সকল বাড়ির মেয়েই যাত্রাকালে বাবুদের লুকিয়ে ব্যবহার্য দু-একটি জিনিস সঙ্গে নিয়ে থাকেন। কবির সংসারেও তার ব্যতিক্রম হত না, কবিপত্নীও কতকগুলি সরঞ্জাম সঙ্গে নিতেন লুকিয়ে। কৌতুক করে আমাদের কাছে আড়ালে বলতেন, "দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কি করে ঘর করা যায়। ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে। অতিথির কারবার তো কবির কম নয়, তখন আনো মালপো, আনো মিঠাই, ভাজো শিঙাড়া, ভাজো নিমকি, কচুরি, তাও আবার কম হলে চলবে না, পাত্র বোঝাই প্রচুর হওয়া চাই। সরঞ্জাম না হলে জিনিস আসবে কোথা থেকে সে-কথা বলে কে।"

কবি আদর্শের টানে নানা সময়ে নানা ভাবে নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলতে মনে কোন দ্বিধা রাখতেন না। আদর্শপ্রবণতা তাঁকে কোথায় কখন কোন সংকটে জড়িয়ে ফেলে, এ ভাবনা কবিপত্নীর মনে থাকত। কবি ও কবির পরিবার অভিন্ন; কবি বিপন্ন হলে পরিবারটিরও বিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। স্বামী-সন্তানের দেহমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ রাখা পত্নী ও জননীর স্বাভাবিক ধর্ম। সকল জননী, পত্নীর মনে এই আদর্শ জাগ্রত। সংরক্ষণের পথেই এই আদর্শের গতি। পুরুষ ছড়ায়, নারী কুড়ায়, বাঁচায়। ঘরে বাইরে পুরুষ ও নারীর এই আদর্শ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টিরহস্যের এক বিশেষ অধ্যায়।

কবির মুখে 'ফেলো ফেলো ছাড়ো ছাড়ো' শুনে কবিপত্নী বলতেন, ঘরকন্না ফেঁদে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করতে গেলে, এক কথায় ফকির সাজা চলে না। পতি-পত্নীর মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান থাকা সম্ভব নয়। একের ভাবে অন্যের যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কবির ভাবে কবিপত্নী অনুপ্রাণিত না হয়ে পারেন নাই।

শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিণী হয়েছিলেন তাঁর সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরির ভার নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হতেই বিদ্যালয়ের জননী কবিপত্নীর আয়ু হল শেষ। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও। প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন; ভাড়া-করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।

স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের, সাধ্বী নারীমাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্তরূপে। তখন ইলেকট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয়নি দেশে। হাতপাখা হাতে ধরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে; কবির ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।

মায়ের বাড়াবাড়ি রোগের সময় ছেলেগুলিকে রেখে গিয়েছিলেন কবি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে। আচ্ছন্ন অবস্থায় কবিপত্নী অনেকবার বলতেন, "আমাকে বলেন ঘুমাও ঘুমাও, শমীকে রেখে এলেন বিদ্যালয়ে, আমি কি ঘুমাতে পারি তাকে ছেড়ে! বোঝেন না সেটা!" জননীর শেষ সন্তান শমী তখন শিশু। ছেলেদের সে সময় যত্নে ও সাবধানে রাখার পক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ই উপযুক্ত স্থান, কবি বুঝেছিলেন। মৃত্যুর ছায়া তাদের মনে ঘনিয়ে আসবে সেটা যেন কবি সইতে পারতেন না।

সন্তানস্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না, প্রথম সন্তানের সম্যক্ যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো, কবি সব করতেন নিজের হাতে। এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।

সন ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ (২৩ নবেম্বর, ১৯০২) রবিবার, শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক ১১ মাস পরে, মাত্র উনত্রিশ বৎসর

বয়সে কবিপত্নী পরলোক গমন করেন, আমি সেদিন অসুস্থ, শয্যাশায়ী। নিজে সে সময়ে যেতে পারিনি ; রাত্রে আমার স্বামী এসে বললেন, "খুড়ির মৃত্যু হয়েছে, কাকামশাই একলা ছাদে চলে গেছেন, বারণ করেছেন কাউকে কাছে যেতে।" প্রায় সারারাত কবি ছাদে পায়চারি করে কাটিয়েছেন শোনা গেল। কবির পিতা মহর্ষিদেব তখন জীবিত। পুত্রের পত্নীবিয়োগের সংবাদে তিনি বলেন, "রবির জন্য আমি চিন্তা করি না, লেখাপড়া নিজের রচনা নিয়ে সে দিন কাটাতে পারবে। ছোট ছেলেমেয়েগুলির জন্যই দুঃখ হয়।" ভাগ্যবতী কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী শ্বশুর স্বামী পুত্র কন্যা জামাতা পরিবেষ্টিত সাজানো সংসার ফেলে গেলেন—কবির সংসার গেল ভেঙে। সেই থেকে নিজের ভাঙা সংসার টেনে নিয়ে চলে আসছেন কবি এ পর্যন্ত। অসংখ্য ভাঙাচোরার বোঝা বুকে নিয়ে কবির সেই ভাঙা সংসার আজ বিশ্বভারতীর বিরাট্ পর্বে হতে চলেছে পরিসমাপ্ত।

কবিপ্রিয়া

উর্মিলা দেবী

আমার দিদি প্রায়ই জোড়াসাঁকোয় যেতেন, কখনো একসঙ্গে দু-তিন মাসও থেকেছেন। আমার ভারি হিংসে হত, কিন্তু কিছু বলার সাহস ছিল না। তাই তিনি যেদিন বললেন "যাবি আমার সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় ?" সেদিন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম। কতকালের অভীপ্সিত দিন আজ। আমি যাব ঠাকুরবাড়ি! সে-বাড়ির কত কথা কত গল্প যে শুনেছি তার ঠিক নেই। সে-বাড়ির মেয়ে-বউরা অপ্সরার মত দেখতে, তাঁরা দুধ দিয়ে স্নান করেন, ক্ষীর সর ছানা বেটে রূপটান মাখেন— কত গয়না, কত কাপড় যে আটপৌরে পরেন তার ঠিক নেই! সে-বাড়ি যাব, তাঁদের-সব দেখব, আবার সঙ্গিনীদের কাছে গল্প করব! আর চাই কী! সবচেয়ে বড় কথা কবিপ্রিয়াকে দেখব। সেদিনের কথাটি এখনও বেশ মনে আছে। দিদি যাঁর কাছে আমায় নিয়ে গিয়ে বললেন "কাকিমা, এটি আমার ছোটবোন", যিনি আদর করে আমায় কাছে টেনে নিয়ে বললেন "তোমার নাম কি ?" তিনি নিতান্তই সাদাসিধে একখানা শাড়ি পরে বসেছিলেন। গায়ে গয়নাও তেমন দেখলুম না। সাহস করে মুখের দিকে চাইলাম— এই কবিপ্রিয়া! রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, সেরকম তো ভালো দেখতে নন। আবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম। তখন দেখি এক অপরূপ লাবণ্যে সমস্ত মুখখানা যেন ঢলঢল করছে, আর একটা মাতৃত্বের আভায় যেন মুখখানা উজ্জ্বল। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। সেই প্রথম দিন থেকেই আমি তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম। তার পর প্রায়ই সে-বাড়ি গিয়েছি, দিদির সঙ্গে থেকেছিও কখনো কখনো। ক্রমেই বুঝতে লাগলাম তিনি খুবই অসাধারণ নারী। যে মাতৃত্বের আভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাই দিয়ে যেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে নয়— আত্মীয়-স্বজন দাসী-চাকর সকলকেই আপন করে রেখেছিলেন। সাজগোজ বেশি কখনও করতেন না। কবিবর মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠ সন্তান— ভাইপো-ভাইঝিরা কেউ সমবয়সী, কেউ-বা অল্পই ছোট ; কিন্তু কবিপ্রিয়া এই সম্বন্ধের গুরুত্বটা যেন বেশ বুঝতেন।

তিনি 'কাকিমা', 'মামিমা', বড় বড় ছেলে-মেয়ে-বউদের সামনে আবার সাজ-গোজ করবেন কী— এমনি যেন ভাবটা। রান্না করে মানুষ খাইয়ে বড় তৃপ্তি পেতেন। আমার দাদা যখনই যেতেন, সিঁড়ি থেকেই বলতে-বলতে উঠতেন "কাকিমা, আজ কিন্তু এটা খাব", "আজ কিন্তু ওটা খাব"; তক্ষুণি রান্নাঘরে গিয়ে সেটা তৈরি করতে বসতেন। কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে সু-উচ্চ কণ্ঠে "ছোটবউ— ছোটবউ" করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন। আমার ভারি মজা লাগত শুনে, তাই বোধ হয় আজও মনে আছে।

কবি অত্যন্ত ভোজনরসিক ছিলেন। খাওয়াটা যে শুধু পেট ভরাবার জন্য নয়, তাতেও যে শিল্পীমনের যথেষ্ট খোরাক আছে, তা তাঁর খাওয়া দেখলেই বোঝা যেত। তিনি ভোজনপ্রিয় ছিলেন না, ভোজনরসিক ছিলেন। আমার মেজদিদিও রন্ধনপটু ছিলেন, কবিকে তিনি অনেক রকম খাবার করে খাওয়াতেন। একদিন তিনি একরকম মিষ্টি করেছিলেন, আমাদের বাঙাল দেশে তাকে বলে এলোঝেলো। কবি সেটা খেয়ে খুব খুশি হলেন ও তার নাম জানতে চাইলেন। নাম শুনে তিনি নাক সিঁটকে বললেন, "এই সুন্দর জিনিসের এই নাম? আমি এর নাম দিলাম 'পরিবন্ধ'।" সেই থেকে ঐ নাম আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে।

তখনকার দিনে তিনি গান রচনা করতেন একেবারে সুর কথা একসঙ্গে। বড় বারান্দায় পায়চারি করতে করতে যেই শেষ হল অমনি চিৎকার আরম্ভ করলেন, "অমলা, ও অমলা, শীগগির এসে শিখে নাও, এক্ষুণি ভুলে যাব কিন্তু।" কবিপ্রিয়া হাসতেন খুব, "এমন মানুষ আর কখনও দেখেছ, অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায়?" কবি অমনি বলতেন, "অসাধারণ মানুষদের সবই অসাধারণ হয়, ছোটবউ— চিনলে না তো!" আমার দিদির সঙ্গে কবি-প্রিয়ার খুব ভাব ছিল। দুজনে গল্প আরম্ভ করলে আর শেষ হত না। কবি নিজে এ নিয়ে খুব কৌতুক করতেন। একদিন হয়েছে কি, কবি তাঁর ঘরে টেবিলে বসে লেখাপড়া করছেন আর শোবার ঘরে তাঁদের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কবিপ্রিয়া আর আমার দিদি খুব গল্প করছেন। এমন তন্ময় হয়ে গেছেন যে, কবি কখন যে এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন কেউ টের পাননি। হঠাৎ মাথার কাছ থেকে বলে উঠলেন, "আমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? আমার ঘুম পায় না?" যেমন কথা কানে গেছে দিদি তো বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে

দশা
ফাল্গুন
মাসে শনির ও
দশা পড়তে। ভাল
অবস্থা কাকে
বলে ও [illegible]
ভাই [illegible] বুঝতে পারছি [illegible]

আজ সকালে
এ অঞ্চলের একজন প্রধান
গণ্যেরা আমার সঙ্গে
দেখা করতে এসেছিল।
সমস্ত সকাল বেলাটা
সে আমাকে জ্বালিয়ে
গেছে — বেশ গুছিয়ে
লিখতে বসেছিলুম
একে ওকে আমাকে কিছু
তেই লিখতে দিলে না।

পত্নীকে লেখা কবির চিঠির অংশ

দে-ছুট উঠিপড়ি করে। কবি তখন খুব হাসছেন আর বলছেন, "অমলা, ও অমলা, অতো ছুটো না, পড়ে যাবে যে!" আর পড়ে যাবে! একেবারে ছুটে এসে বিছানায় মুখ লুকিয়ে পড়ে আছেন। সকালবেলা দেখা হতে কবি একটু একটু হাসছেন আর বলছেন, "অত লজ্জা পাবার কি হল তোমার? আমি তো বেশ উপভোগ করছিলাম ব্যাপারটা।" এসব কথা কিছু-কিছু আমার প্রত্যক্ষ, কিছুটা আমার দিদির কাছে শোনা।...

কবিপ্রিয়ার মধ্যে একটা জিনিস খুব উজ্জ্বল হয়ে ছিল, আর সেটা তাঁর জীবনপথের আলো হয়ে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। সেটি শ্বশুরের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কতবার যে তাঁর মুখে শুনেছি, "বাবামশায়ের মত এটা নয়, আমি এ কাজ কখনো করব না।" কবির সঙ্গে তর্ক করেছেন এভাবে, "বাবামশায় এটা পছন্দ করেন না, এটা আমি করব না।" কিংবা, "বাবামশায় থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে?" এটা যেন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। মহর্ষিদেবের সন্তানদের মধ্যে বোধ করি সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন কনিষ্ঠটি। এই পুত্রবধূটির প্রতিও তাঁর স্নেহের অন্ত ছিল না। আর প্রগাঢ় স্নেহ ছিল রথীর প্রতি। রথীর রঙ ময়লা এটা কিছুতে মহর্ষি স্বীকার করতেন না। বলতেন, "তোমরা কি যে বল, রথী তো রবির চেয়ে ফরশা।" এ নিয়ে তাঁর সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস না পেলেও আড়ালে বেশ হাসাহাসি হত।

কবিপ্রিয়ার কিন্তু কবির উপর অখণ্ড প্রতাপ ছিল। কবি তাঁকে বেশ ভয় করতেন। তাঁর অভিমানও প্রবল ছিল, আর সে-অভিমান ভাঙতে কবিকে বেশ বেগ পেতে হত। কিন্তু এঁটে উঠতে পারতেন না তিনি তাঁর মেজ মেয়েটিকে। রানী এক অদ্ভুত মেয়ে ছিল। কি যে এক সন্ন্যাসিনীর মন নিয়ে এসে জন্মেছিল ঐশ্বর্যের মধ্যে! বিধাতার অনেক অদ্ভুত খেয়ালই বোঝা যায় না তো! খুব যে সুন্দর দেখতে ছিল তা নয়, কিন্তু চোখদুটির মধ্যে এমন একটি ভাব ছিল যে তা থেকে চোখ ফেরানো যেত না। শিশুকাল থেকে তার সাজগোজ ভালো লাগত না, চুল বাঁধা তো একটা বিরক্তিজনক ব্যাপার ছিল। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও তার ঔদাসীন্যের অন্ত ছিল না। মাছমাংস খাওয়ার স্পৃহামাত্র ছিল না। কিন্তু জেদ ছিল প্রচণ্ড। সে যখন এক দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়াত তখন কারো সাধ্য ছিল না

তাকে দিয়ে কিছু করায়। এজন্য শাসন সে যথেষ্ট পেত। তার মা তো একেবারে অস্থির হয়ে পড়তেন এক-এক সময়ে—"কি যে ছিষ্টিছাড়া মেয়ে জন্মেছে, আর পারিনে, বাপু!" এক-এক সময়ে বলতেন। রানী কিন্তু বকুনি শাসন শাস্তি সবেতেই অচল অটল। কবি কিন্তু তাঁর এই মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন, তাকে বুঝতেনও হয়তো। লেগে যেত কবিপ্রিয়ার সঙ্গে আমার দিদির সঙ্গে রানীকে নিয়ে। তিনি বলতেন, "কাকিমা, আপনারা কেউ ওকে বোঝেন না। ওর মধ্যে যে একটা মহাপ্রাণ আছে তা আপনারা দেখেন না।" রানী যখন খোলা ছাতে মনের আনন্দে ছুটে বেড়াত, চুলগুলো তার বাতাসে নাচত—মনে হত একটি তেজী ঘোড়া যেন মুক্তির আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। রানী সম্বন্ধে দুটো ঘটনা খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনে। নীতুবাবু রানীকে বড্ড ভালোবাসতেন, তার প্রত্যেক জন্মদিনে বেশ দামী দামী উপহার এনে দিতেন। একবার রানীর জন্মদিনে আমরাও গিয়েছি। 'লেড্‌ল'র বাড়ি থেকে একটা বাক্স এল নীতুবাবুর উপহার নিয়ে। বাক্স থেকে বেরোল এক বহুমূল্য ফ্রক, লেস ফ্রিল ইত্যাদি দিয়ে তৈরী সিল্কের ফ্রক। ফ্রকের বাহার দেখে সকলেই খুব খুশি, সকলেই খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। রানীকে ডেকে সেই ফ্রক তার গায়ে চড়ানো হল। সে হতভম্ব হয়ে আয়নার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একবার লেসগুলোতে হাত দেয় আর মুখ বাঁকায়, একবার ফ্রিলগুলো তুলে তুলে দেখে আর মুখ বাঁকায়। একটু পরে পটপট করে লেসগুলো ফ্রিলগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফ্রকটা টেনে গা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে তো হুলস্থূল! তার মা আমার দিদিকে ডেকে বললেন, "ও অমলা, দেখে যাও তোমার অসাধারণ বোনটির কাণ্ড। আমি এখন নীতুকে মুখ দেখাব কি করে?"—ইত্যাদি-ইত্যাদি। আমার দিদি তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে কৌচে বসলেন। সে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে চুপ করে রইল। একটু পরে দিদি বললেন, "রানী, কাজটা ভালো করনি ভাই। তোমার মা দুঃখ পেয়েছেন, তোমার নীত্‌দা শুনলে কত দুঃখ পাবেন।" সে মুখ তুলল, বিষণ্ণ দুটি চোখ মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "অমলাদি, ওরা জানে আমি এসব ভালোবাসিনে, এসব পরতে আমার কষ্ট হয়, তবু কেন আমায় ওরা জোর করে পরায়?"

আর একবার মহাল থেকে মাছ এসেছে, সবাই ছুটে দেখতে গেছে। দুটো প্রকাণ্ড কাতলা মাছ তখনও একটু-একটু খাবি খাচ্ছে। সবাই নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছে, মাছ দিয়ে কী-কী রান্না হবে। রানীও এক পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল, "ও মা, মা গো, ওই মাছ তোমরা খাবে? ওরা যে এখনো বেঁচে আছে।" বলে দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে ছুটে পাশের ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কী তার কান্না!

একদিন কবি এসে বললেন, "ছোটবউ, রানীর বিয়ে ঠিক করে এলুম, মাঝে মাত্র তিনটি দিন আছে, তার পরদিন বিয়ে।" কবিপ্রিয়া অবাক্ হয়ে বললেন, "তুমি বল কি গো? এরই মধ্যে মেয়ের তুমি বিয়ে দেবে?" কবি বললেন, "ছেলেটিকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে ছোটবউ, যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি মিষ্টি অমায়িক স্বভাব। রানীটা যে জেদী মেয়ে, ওর বর একটু ভালোমানুষ-গোছের না হলে চলবে কেন? আর সত্যেন বিয়ের দুদিন পরেই বিলেত চলে যাবে। সে ফিরতে ফিরতে রানী বেশ বড় হয়ে উঠবে।" কবিপ্রিয়া বললেন, "এই তিন দিনের মধ্যে সব জোগাড় কী করে হবে?" "হবে হবে, সব হবে, কলকাতা শহরে নাকি কিছু আটকায়? শুধু তুমি একটু প্রসন্ন মনে কাজে লেগে যাও তো, ছোটবউ, সব ঠিক হয়ে যাবে।" হলও তাই। তবে রানীর বিয়েতে সমারোহ বেশী কিছু হল না। রানী কিন্তু এ বন্ধনটা খুব খুশী মনে নিতে পারল না, তার ভুরু একটু কুঁচকেই রইল। বিয়ের পরই বর বিদায় হবে শুনে একটু নিশ্চিন্ত হল। বিয়ের সব কাজেই সে লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা নিচু করে রইল।...

এক কথায় কত কথা এসে গেল তার ঠিক নেই। যাক, আমার মনে হয়, কবিপ্রিয়া যদি অকালে না চলে যেতেন তবে কবির শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠত সকল দিক দিয়ে। ছেলেরা ঘর ছেড়ে এসে ঘর পেত, মাতৃস্নেহ পেত, রোগে সেবাযত্ন পেত, আর সুখে-দুঃখে সহানুভূতি পেত। কবি যে এ অভাবে কত অসহায় হয়েছিলেন তা তাঁর কথায় একদিন আমি বুঝেছিলুম। যখন আমার ছেলেকে রাখতে আমি শান্তিনিকেতনে যাই তখন আমায় বলেছিলেন, "তোমাদের ছেলেরা যে যত্নে মানুষ, এখানে কি থাকতে পারবে? এখানে অনেক কষ্ট। আমি তাদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না। রথীর মা সে-বিষয়ে আমায় অসহায় করে

রেখে গেছেন।" তার দীর্ঘদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তখনও সে-অভাব তিনি বোধ করছেন।

কবিপ্রিয়া স্বর্গতা হবার অনেকদিন পর কী একটা কারণে কবির সংসারে একটা ক্ষণিক বিপ্লব ঘটে। তখন একদিন তিনি আমার মেজদিদিকে বলেছিলেন, "দেখো, অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে-কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনো-একটা সমস্যায় পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন। এবারেও আমি কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আর আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই।"

জীবনপঞ্জি

১২৮০ ফাল্গুন। ১৮৭৪ মার্চ॥ জন্ম: খুলনা জেলার দক্ষিণডিহির ফুলতলা গ্রামে। পিতা বেণীমাধব রায়চৌধুরী। মাতা দাক্ষায়ণী দেবী।

(?) ১২৮৭। ১৮৮০॥ শিক্ষারম্ভ: গ্রামের পাঠশালায়। প্রথম বর্গ পর্যন্ত পড়াশুনা।

১২৯০ অগ্রহায়ণ ২৪। ১৮৮৩ ডিসেম্বর ৯॥ বিবাহ: দশ বৎসর বয়সে, বাইশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের সহিত। জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে শুভকার্য সম্পন্ন হয়।

১২৯০ ফাল্গুন ১৯। ১৮৮৪ মার্চ ১॥ ইংরেজি শিক্ষা: মহর্ষির আদেশে ইংরেজি শিক্ষার জন্য নববধূকে লরেটো হাউসে স্বতন্ত্র-ভাবে ভর্তি করার ব্যবস্থা। স্লেট ও পুস্তক ইত্যাদি ক্রয়।

১২৯০ চৈত্র ৯। ১৮৮৪ মার্চ ২১॥ নববধূর স্কুলের পরিচ্ছদ তৈরির ব্যবস্থা।

১২৯১ বৈশাখ-চৈত্র। ১৮৮৪-৮৫॥ এক বৎসর কাল লরেটোতে শিক্ষা লাভ।

(?) ১২৯২ বৈশাখ-চৈত্র। ১৮৮৫-৮৬॥ রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে মহর্ষিভবনে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা।

১২৯৩ কার্তিক ৯। ১৮৮৬ অক্টোবর ২৫॥ প্রথম সন্তান বেলা বা মাধুরীলতার জন্ম।

(?) ১২৯৩। ১৮৮৭॥ স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখিসমিতি' ও 'শিল্পমেলা'র কর্ত্রীসভার 'সখী'রূপে নির্বাচিতা।

(?) ১২৯৪ চৈত্র। ১৮৮৮ মার্চ-এপ্রিল॥ স্বামী ও শিশুকন্যা সহ গাজিপুরে গমন ও বাস। কবির মানসী কাব্যের যুগ: এখানে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ থেকে আষাঢ় এই তিন মাসে ২৮টি কবিতা রচনা করেন।

১২৯৫ অগ্রহায়ণ ১৩। ১৮৮৮ নবেম্বর ২৭॥ দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথের জন্ম।

(?) ১২৯৬ পূজার ছুটি। ১৮৮৯ অক্টোবর-নবেম্বর॥ কবির সদ্য প্রকাশিত

'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয়ে মৃণালিনী দেবীর 'নারায়ণী'র ভূমিকায় সার্থক অভিনয় (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে)।

১২৯৬ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৯ নবেম্বর-ডিসেম্বর ॥ স্বামী ও পুত্রকন্যা সহ শিলাইদহে পদ্মাবক্ষে 'পদ্মা' বোটে বাস।

১২৯৭ মাঘ ১১। ১৮৯১ জানুয়ারি ২৩ ॥ তৃতীয় সন্তান রানী বা রেণুকার জন্ম।

১২৯৮ গ্রীষ্মকাল। ১৮৯১ এপ্রিল-মে ॥ স্বামী ও সন্তানগণ সহ প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন ও 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির (আদি বাড়ি) দোতলায় বাস।

১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯১ মে-জুন ॥ শান্তিনিকেতন থেকে কলিকাতা গমন।

১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ১৮৯২ ॥ দ্বিতীয় বার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১২৯৯ অগ্রহায়ণ ৩। ১৮৯২ নবেম্বর ১৭ ॥ শিশুসন্তানদের ও কুমারী ইন্দিরাকে সঙ্গে নিয়ে সোলাপুরে জ্ঞানদানন্দিনীর নিকট গমন।

১২৯৯ পৌষ ২৯। ১৮৯৩ জানুয়ারি ১২ ॥ চতুর্থ সন্তান মীরা দেবীর জন্ম।

১৩০১ অগ্রহায়ণ ২৮। ১৮৯৪ ডিসেম্বর ১৩ ॥ পঞ্চম ও সবশেষ সন্তান শমীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৩০৪ কার্তিক-পৌষ। ১৮৯৭-৯৮ ॥ তৃতীয় বার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৬ ভাদ্র-১৩০৭ চৈত্র। ১৮৯৯-১৯০১ ॥ শিলাইদহে বাস।

১৩০৮ বৈশাখ। ১৯০১ এপ্রিল-মে ॥ চতুর্থ বার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৮ আষাঢ় ১। ১৯০১ জুন ১৫ ॥ বিহারীলালের পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত প্রথম কন্যা বেলা বা মাধুরীলতার বিবাহ। বিবাহের পূর্বে ২৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহর্ষি বরকে দশ হাজার পাঁচ টাকা যৌতুক দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

১৩০৮ শ্রাবণ ২৪। ১৯০১ আগস্ট ৯ ॥ ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সহিত দ্বিতীয় কন্যা রানী বা রেণুকার এগারো বৎসর ছয় মাস বয়সে বিবাহ। মহর্ষি বরকে যৌতুক স্বরূপ চারটি মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

১৩০৮ ভাদ্র। ১৯০১ আগস্ট-সেপ্টেম্বর॥ পঞ্চম বার শান্তিনিকেতনে আগমন।

১৩০৮ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯০১॥ ষষ্ঠ বার শান্তিনিকেতনে আগমন ও বাস। [পৌষ মাসের সাত তারিখে (ডিসেম্বর ২২) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে মৃণালিনী দেবী শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কাজে তিনি ছিলেন কবির সহিত একাত্ম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তাঁর এই বিদ্যালয়ের জন্য সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী নিজের অলংকারাদি অক্লেশে দান করেছেন।]

১৩০৮ চৈত্র। ১৯০২ মার্চ-এপ্রিল॥ সপ্তম ও সর্বশেষ বার শান্তিনিকেতনে আগমন ও বাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ।

১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২ জুন-জুলাই॥ শান্তিনিকেতনে রোগাক্রান্ত।

(?) ১৩০৯ ভাদ্র ২৭। ১৯০২ সেপ্টেম্বর ১২॥ চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় স্থানান্তরিত।

১৩০৯ অগ্রহায়ণ ৭। ১৯০২ নবেম্বর ২৩॥ জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনে দেহাবসান।

বিবাহের ব্যয়

১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীর শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ এবং মৃণালিনীর বয়স দশ বৎসর। বিবাহে ঘটকালি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মামা ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসিমা আদ্যা-সুন্দরী দেবী। প্রচলিত প্রথায় কন্যার পিত্রালয়ে বরাহ্বানে বিবাহ হওয়ার কথা। কিন্তু মহর্ষির ইচ্ছানুসারে আদি ব্রাহ্মসমাজ-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য কন্যাকে পিত্রালয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল মহর্ষিভবনে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ব্রহ্মোৎসব-দালানে শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই শুভানুষ্ঠানের কথা রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর একখানি পকেটসাইজ দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং তা এই রকম: "২৪ অগ্রহায়ণ ৫৪ / রবির বিবাহ এবং শিলাইদহ কুঠিতে সারদার মৃত্যু হয়।"

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মহর্ষির পারিবারিক খরচপত্রের খাতায় রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে কোন তারিখে কত খরচ হয়েছিল যেমন যেমন লিপিবদ্ধ আছে তা নিম্নে উদ্ধৃত হল। প্রথম খরচপত্রের হিসাব পাওয়া যায় ১২৯০ সালের (ইং ১৮৮৩-৮৪) সরকারী ক্যাশ বহিতে।

জের ৮ আশ্বিন ১২৯০ সোমবার ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩
রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের বিবাহের হিসাব
বং মেঃ গ্রানতাস সারবতনট এণ্ড কোং
দং ৬৯ রতি হিরা ২৫৲ হিঃ ১৭২৫৲ টাকার মধ্যে কমিশন বাদ ১২৮৶৹
বাকী ১৭১২ ৴৹ গাড়ি ভাড়া ১।৴৹ =১৭১৩।৶৹
জের ১১ আশ্বিন ১২৯০ বৃহস্পতিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩
রবীন্দ্রবাবুর বিবাহ উপলক্ষে

হিরে ক্রয়	...	১৭১২৴৹
হিরে আনিতে গাড়ি ভাড়া	...	১।৴৹
কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় কাপড় তৈয়ারির জন্য	...	২০৲
মৃত্যুঞ্জয় বাবুর নিকট টেলিগ্রাম	...	৩।৶৹
		১৭৩৬৷৹

জের ১৭ আশ্বিন ১২৯০ বুধবার ৩ অক্টবর ১৮৮৩

রবীন্দ্রবাবুর বিবাহ উপলক্ষে

খং ... ১৭৩৬৸০

১৫ রোজ

কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় ... ৩০৲

১৭ রোজ

অভয়চরণ ঘোষ

জশরে গমন জন্য ... ২৫৲

১৭৯১৸০

জের ২৩ কার্ত্তিক ১২৯০ বৃহস্পতিবার ৮ নবেম্বর ১৮৮৩

রবীবাবুর বিবাহের হিসাব ... ১৭৯১৸০

কানাই মল্লিক আংটী তৈয়ারির জন্য ... ১০৲

১৮০১৸০

জের ২৭ কার্ত্তিক ১২৯০ সোমবার ১২ নবেম্বর ১৮৮৩

রবীন্দ্রবাবুর বিবাহের হিসাব

খং ... ১৮০১৸০

বং প্রিয়নাথ সেন জশর লইয়া যান ... ২৫০৲

শ্রীমতী নতুন বধূঠাকুরানীর কাপড় ও পাড়

ক্রয়ের মূল্য ... ৭০৲

২১২১৸০

বিতারিখ ৫ অগ্রহায়ণ ১২৯০ মঙ্গলবার ২০ নবেম্বর ১৮৮৩

শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর হিসাবে ... ২১২১৸০

বং কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়

দং নিজ রোজ ঐ হিসাবে দেওয়া

গুঃ খোদ রোক ... ৫০৲

২১৭১৸০

জের ১২ অগ্রহায়ণ ১২৯০ মঙ্গলবার ২৭ নবেম্বর ১৮৮৩

রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর হিসাব ... ২১৭১৸০

বং কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় খরচ জন্য ... ১০০৲

২২৭১৸০

বাদ স্বর্ণ বিক্রী
মাং যাদব দত্ত মোঃ বড়বাজার
স্বর্ণ বালা ২ গাছ ওজন ২০৶০ ভরি
দং ১৮।০ হিসাবে ... ৩৬৮।০

১৯০৩॥০

ঐ বালা বিক্রয় জন্য বড়বাজার যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ১৶৬

জের ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৯০ মঙ্গলবার ৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩
রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহের ব্যয় ... ১৯০৩॥০
১৫ রোজ
বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় গুঃ খোদ ... ৫০৲
১৮ রোজ বং ঐ ... ১০০৲
বং কানাই মল্লিক
দং সোনার আংটী ও তাগার মূল্য
৬৮৲ টাকার মধ্যে বায়না ১০৲ টাকা দেওয়া বাদে
৫৮৲ টাকার মধ্যে দেওয়া যায়
গুঃ খোদ ... ৫০৲

২১০৩॥০

স্বর্ণ বালা বড়বাজারে বিক্রয় করিতে
যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ... ১৶৬

জের ২১ অগ্রহায়ণ ১২৯০ বৃহস্পতিবার ৬ ডিসেম্বর ১৮৮৩
রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহের ব্যয় ... ২১০৩॥০
নিজ রোজ বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়
দং খরচ জন্য দেওয়া যায়
নোট ও রোক ... ১৩০৲
নিমন্ত্রণপত্রের মাশুল দেওয়া যায়
৩ খান পত্রের কার্ড ... ৶৬

২২৩৩॥৶৬

স্বর্ণ বালা বড়বাজারে বিক্রয় করিতে যাতায়াতের
গাড়ি ভাড়া ... ১৶

২২৩৪৸৶০

জের ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৯০ বৃহস্পতিবার ১৩ ডিসেম্বর ১৮৮৩
শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর ব্যয় ... ২২৩৪৸৶০
দঃ ২২ অগ্রহায়ণ
বং শ্যামাদাস চাকর
বিঃ উঁহাকে রেপারের মূল্য দেওয়া হয় ৮৲
বিঃ বেণীমাধব রায়ের থাকিবার বাটীর ভাড়ার মধ্যে
টেক্স দেওয়া যায় ২২৻৩
গুঃ অভয়চরণ ঘোষ ৩০৻৩
২৩ রোজ
বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়
গুঃ খোদ রোক ১০০৲
বঃ প্রিয়নাথ সেন
দঃ যশহর যাওয়ার ব্যয় মধ্যে
গুঃ খোদ ২১৲
কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট নিমন্ত্রণপত্রের মাশুল ৻৬

১২১৻৯

২৭ রোজ
আদি ব্রাহ্মসমাজে দান দেওয়া হয় ১০০৲
দং শম্ভুনাথ গড়গড়ির পাথেয় বাবদে দেওয়া হয় ২৸০

১০২৸০

২৪৮৮৶৯

বিতারিখ ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯০ শুক্রবার ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহর ব্যয় ... ২৪৮৮৶৯
কন্যাপক্ষের লোকের বিদায় প্রণামী দেওয়া যায়
গুঃ বেণীমাধব রায় ... ৯৬৲

জের ৩ পৌষ ১২৯০ সোমবার ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮৩

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর বিবাহের খরচ	...	২৫৮৪৶৯
বেণীমাধব রায়ের পাথেয় বাসাখরচ	...	৬০৲
নিমন্ত্রণের পত্র লেখা চিঠির কাগজ	...	।৴৬
		২৬৮৪॥৴৩

জের ৭ পৌষ ১২৯০ শুক্রবার ২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩

রবীবাবুর বিবাহের হিসাব খং	...	২৬৪৪॥৴৩
জগন্নাথ সেকরা মজুরি শোধ	...	১৮॥৶৬
		২৬৬৩।৯

বিতারিখ ১০ পৌষ ১২৯০ সোমবার ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩

রবীন্দ্রবাবুর বিবাহের হিসাব	...	২৬৬৩।৯
কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়	...	৪০৲
		২৭০৩।৯

জের ১৯ পৌষ ১২৯০ বুধবার ২ জানুয়ারি ১৮৮৪

রবীবাবুর বিবাহের হিসাব	...	২৭০৩।৯
গুঃ রবীবাবু শাল ১৭৫৲ ও গরদ ৩০৲ একুনে ২০৫৲ মধ্যে ১০০৲ ও গোপাল চক্রবর্ত্তী ৪৮৲	...	১৪৮৲
		২৮৫১।৯

জের ২২ পৌষ ১২৯০ শনিবার ৫ জানুয়ারি ১৮৮৪

রবীবাবুমহাশয়ের বিবাহের হিসাব		২৮৫১।৯
নিজ রোজ হেরম্বনাথ তর্করত্নর দক্ষিণা দেওয়া যায়		৮৲
		২৮৫৯।৯

বিতারিখ ২৪ পৌষ ১২৯০ সোমবার ৭ জানুয়ারি ১৮৮৪

রবীবাবু মহাশয়ের বিবাহর হিসাবে	...	২৮৫৯।৯
বং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং শালের জোড়া ও বেনারসী জোড়ের মূল্য ২০৫৲ টাকার বাকি শোধ দেওয়া যায়		
গুঃ লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	৫৭৲
		২৯১৬।৯

বিতারিখ ২৯ পৌষ ১২৯০ শনিবার ১২ জানুয়ারি ১৮৮৪			
রবীবাবুর বিবাহের হিসাবে		...	২৯১৬।৯
বাদ স্বর্ণ অলঙ্কার বিক্রী		...	৬২১৲
			২২৯৫।৯
জের ২ মাঘ ১২৯০ মঙ্গলবার ১৫ জানুয়ারি ১৮৮৪			
রবীবাবুর বিবাহের হিসাবে		...	২২৯৫।৯
বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়			
দং বেনারসী জোড়ের মূল্য বাবদ	৩০৲		
এবং চেলী কাপড়ের মূল্য বাবদ	৭০৲		
একুনে গুঃ খোদ রোক		...	১০০৲
			২৩৯৫।৯
বিতারিখ ৬ মাঘ ১২৯০ শনিবার ১৯ জানুয়ারি ১৮৮৪			
রবীন্দ্রবাবুর বিবাহর হিসাবে		...	২৩৯৫।৯
কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়		...	১০০৲
		...	২৪৯৫।৯
বিতারিখ ১৫ মাঘ ১২৯০ সোমবার ২৮ জানুয়ারি ১৮৮৪			
রবীন্দ্রবাবুর বিবাহর হিসাবে		...	২৪৯৫।৯
বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়			
গুঃ খোদ		...	১৮৯৲
			২৬৮৪।৯
জের ২৬ ফাল্গুন ১২৯০ শনিবার ৮ মার্চ ১৮৮৪			
রবীন্দ্রবাবুর বিবাহর হিসাব		...	২৬৮৪।৯
২৫ ফাল্গুন গোপালচন্দ্র দাস			
দং চেন আদির বানী			
গুঃ কালাচাঁদ নন্দন		...	৬৭॥৬
নিজ রোজ বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়			
গুঃ খোদ		...	২০০৲
			২৯৫১৸/৩

ওঁ

অনুষ্ঠান খাতা
১২৯১ সাল
১৮৮৪।৮৫

জমা — খরচ

২৮ শ্রাবণ ১২৯১
৯ আগষ্ট ১৮৮৪

বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
শুভ বিবাহের ব্যয়
বি: এক হিসাব
(১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ বিবাহ হয়)
ক্রেং ক্যাশ খাতা
৩১৫৩৸৩

ওঁ — ১১৪৫

বিদ্যাভ্যাস খাতা
১২৯১ সাল
১৮৮৪।৮৫

জমা — খরচ

২২ বৈশাখ ১২৯১
৩ মে ১৮৮৪
ঐ ১৮ বৈশাখ শেষ মাসান্ত

বং লরেটো হাউস স্কুল
ঐ শ্রীযুক্ত রবীবাবু মহাশয়ের স্ত্রীর
ঐ স্কুলে শিক্ষার ব্যয়
বোর্ড ও টিউশনী ব্যয় ১৮৮৪ সালের
এপ্রেল মাসের দরুণ
১৫৲

বিবাহের হিসাব ও শিক্ষার ব্যয়

জের ২ চৈত্র ১২৯০ শুক্রবার ১৪ মার্চ ১৮৮৪

রবীবাবুর বিবাহর হিসাবে		২৯৫১৮/৩
নিজ রোজ বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়		
গুঃ খোদ	...	২০৫৲
		৩১৫৬৮/৩

উল্লিখিত ৩১৫৬৮/৩ পাই সহ সর্বমোট কত খরচ হয়েছিল তার নির্দেশ পাওয়া যায় ১২৯১ সালের (ইং ১৮৮৪-৮৫) 'সরকারী ক্যাশের খতিয়ান বহি'তে। উক্ত খতিয়ানের 'অনুষ্ঠান খাতা'-অংশে নিম্নলিখিত হিসাব লিপিবদ্ধ রয়েছে :

২৮ শ্রাবণ ১২৯১ / ৯ আগস্ট ১৮৮৪
বং কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভবিবাহের ব্যয়
বিঃ এক হিসাব (১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ বিবাহ হয়)

কৈ. হা. আদায়	...	৩১৫৬৮/৩
গুঃ খোদ নোট ও রোক	...	১২৬ ৶০
		৩২৮৩ ৫৩

২ পৌষ ১৩০৯ সালের — ২৮০৷৵৩

বিং জানকীনাথ বিশ্বাস —

৩ স্বর্গীয় ছোট বউ ঠাকুরাণীর —

চিকিৎসার ব্যয় মোট —

ঔষধাদি — ৮৬৸৵

ডাক্তারের ফি —
১৪২

নার্সের ফি —
২৩

গাড়ী ভাড়া —
২৯

শিশি খরিদ —
৯৷৵

বিছানা তৈয়ারী —
৪।।

বাজে খরচ —
৩৬৸৶

চিকিৎসা — ৪৭০৸৶

হাং জানকী —
৪৪৫

দাদা —
২৫৸৶

৪৭০৸৶

৪৭০৸৶

৩ স্বর্গীয় ছোট বউ ঠাকুরাণীর —
১৩০৯ সালের ৭ অগ্রহায়ণ রাত্রে —
মৃত্যু হওয়ায় —

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যয় —
২য় দফা —
২৮৩

শ্রীমতী বেলা দেবী —
চতুর্থী শ্রাদ্ধ ও হোমকীর্ত্তন করেন —
তাহার ব্যয় —
২২৸৶

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবু সহোদয় —
শ্রাদ্ধ করেন তাহার ব্যয় —
১৪২৸৶

হোমকীর্ত্তন করার ব্যয় —
১৯/৩

১১১৸৶

২য় দফা —
১৮৪৸

২১২৸৶

২৫২৸৶

শেষ চিকিৎসা ও পারলৌকিক ক্রিয়ার ব্যয়

অমলা : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী

কাদম্বরী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

কাদম্বিনী : গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী

কৃতীন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র

জগদিন্দ্রনাথ : নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়

ত্রিপুরাসুন্দরী : নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

দিনেন্দ্রনাথ : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র

দ্বিপেন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র

নগেন্দ্রনাথ : বেণীমাধব রায়চৌধুরীর পুত্র, মৃণালিনী দেবীর ভ্রাতা

নলিনী : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

নীতীন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র

নীপময়ী : হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

প্রফুল্লময়ী : বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

প্রিয়নাথ : 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক', রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বন্ধু

বলেন্দ্রনাথ : বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র

মনোমোহন ঘোষ : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু, বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও স্বদেশসেবী

মর্লি : লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেনরি মর্লি

রানী / রেণুকা : রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কন্যা

লোকেন্দ্রনাথ : ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের পুত্র

সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জামাতা, রেণুকার স্বামী

সুকুমার : রাখালদাস হালদারের পুত্র

সুধীন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র

সুশীলা : শরৎকুমারী দেবী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা

হেমলতা : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

শর্বরী গিয়াছে চলি : 'যৌতুক কি কৌতুক'-এর শেষাংশ। দ্র ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০, পৃ ৬৪

মৃণালিনী দেবী : দ্র কবির কথা, ১৩৬১, পৃ ১০-২৩

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংকলিত

কবিপত্নী : দ্র বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ ৩৬২-৬৩

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষের সৌজন্যে সংকলিত

স্মৃতিকথা ১ : দ্র ঘরোয়া, ১৩৭৭, পৃ ১০৬-০৭

শ্রীমতী রানী চন্দের সৌজন্যে সংকলিত

স্মৃতিকথা ২ : রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

স্মৃতিকথা ৩ : দ্র পিতৃস্মৃতি, ১৩৭৮, পৃ ১৩-৮২

স্মৃতিকথা ৪ : রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি

রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর : দ্র সমকালীন, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ ১৯-২১

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে সংকলিত

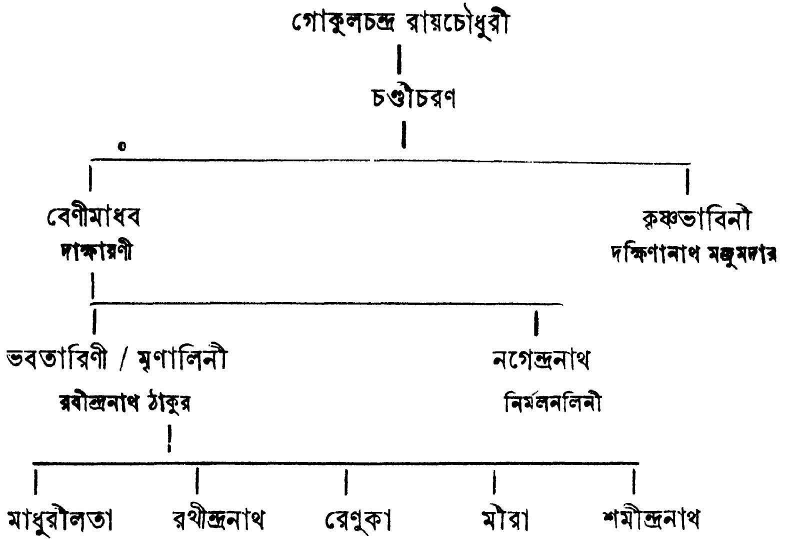
সংসারী রবীন্দ্রনাথ : দ্র প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৬, পৃ ৩০২-০৭

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে সংকলিত

কবিপ্রিয়া : দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২, পৃ ২৪৪-৪৯।

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ সেনের সৌজন্যে সংকলিত

বংশলতিকা



গোকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী
চণ্ডীচরণ
বেণীমাধব
দাক্ষায়ণী
কৃষ্ণভাবিনী
দক্ষিণানাথ মজুমদার
ভবতারিণী / মৃণালিনী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নগেন্দ্রনাথ
নির্মলনলিনী
মাধুরীলতা
রথীন্দ্রনাথ
রেণুকা
মীরা
শমীন্দ্রনাথ